যখন হরবল্লভের 'ষড়যন্ত্রে' নিজের প্রাণ-যায়—নিজের প্রাণ অপেক্ষা সহস্রগুণ প্রিয় ও পবিত্র, অসময়ের সহায় দেবী-চৌধুরাণী, 'মনোমন্দিরের সোণার প্রতিমা' প্রফুল্লের প্রাণ যায়—তখনও পিতৃবৎসল ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিতেছেন, "তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছারপ্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

কবি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে 'দেবী-চৌধুরাণী' কাব্য উৎসর্গ করিয়াছেন। ব্রজেশ্বরের চিত্রে এই উৎসর্গ সার্থকীকৃত হইয়াছে।

ব্রজেশ্বরের চিত্র একস্থানে ঈষৎ অস্বাভাবিকত্বসংশ্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যখন হরবল্লভ প্রফুল্লকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য ব্রজকে আদেশ করিলেন, তৎপরক্ষণেই বৃদ্ধা ব্রহ্মঠাকুরাণীর হিত ব্রজের রসাভাস তাদৃশ স্বাভাবিক লিয়া বোধ হয় না। তবে 'মরমরথা' সচরাচর প্রকাশ করা ব্রজের নাকি স্বভাব নয়, এই বলিয়াই যাহা হউক।

সাগরের চিত্রের কোন কোন স্থলে অত্যল্পপরিমাণে 'ভ্রমরত্ব' আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু সে নিতান্ত সামান্য। ভ্রমরের চরিত্র সাগর অপেক্ষা অনেক উন্নত, অনেক উজ্জ্বল। ভ্রমরের জীবনের প্রথমাংশের বাহ্যভাব কতকটা সাগরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মুখরা সাগরের অপেক্ষাকৃত চঞ্চল প্রকৃতির অভ্যন্তরে অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও অচলা পতিভক্তির অভাব নাই। দেবী-চৌধুরাণীর বজরায় সাগরের সেই চুপি চুপি [illegible]

দিবা-নিশি দেবী রাণীর দুই সহচরী। উভয়েই গুণবতী। ব্রেনানকে 'বাঁদর খেলাইবার' জন্যই বোধ হয় দিবার সৃষ্টি। দিবানিশির নিকট 'দেবী-রাণীর' ভগদ্ব্যাখ্যা অতি পরিপাটী। ইহা একদিকে যেমন দিবার স্বাভাবিক অকৃত্রিম সরলতাপ্রকাশক, অপর দিকে তেমনি দেবী-রাণীর পাণ্ডিত্য ও ততোধিক স্বভাবের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতার পরিচায়ক। নিশি 'ঠাকুরবিহীন' ঠাকুরাণী, পণ্ডিতা, দেবীর সহপাঠী, বিষয়-অনাসক্তা বৈষ্ণবী, রঙ্গপ্রিয়া, রসিকার অগ্রগণ্যা। নিশিঠাকুরাণীর এক আধ টুকরা রসিকতা পাঠককে উপহার দিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাব।

'নয়ান বৌ' ও হরবল্লভের চরিত্র অসামান্য দক্ষতার সহিত অঙ্কিত। এখনকার বঙ্গসমাজে সাবেক আমলের যদি কি থাকে, তাহা—দুই-দশটা 'নয়ান বৌ' আর এক আধ জন হরবল্লভ। হরবল্লভ 'গুজস্তা ঘাগী বকেযা সয়তান'। এই সয়তানি কতকটা কুসংস্কার ও কুশিক্ষাজনিত। কিন্তু সয়তানী ও স্বার্থপরতাসত্ত্বেও হরবল্লভ জাতীয় লোকের মধ্যে সদভিপ্রায় ও স্বজনপ্রিয়তাবিরল নহে। হরবল্লভরায়ের পুত্রবাৎসল্য প্রসংশনীয়।

ব্রহ্মঠাকুরাণী, 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর' সহিত, বঙ্গসমাজ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়াছেন, আমরা তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। এইরূপ 'ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমী' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে অনেক নীতি, কর্ম্মজ্ঞান ও সদাচার-শিক্ষা আছে, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

গিন্নীর চিত্র চূড়ান্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীস্থ গিন্নীর অভাবে দেশ হইতে 'নারী-ধর্ম্ম' পলাইবার উপক্রম করিয়াছে এবং

'ভাতের মাছি' কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না।

বঙ্কিমবাবু যে অবয়বের বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের। বঙ্কিমপূর্ব্বর্ত্তিত বাঙ্গালাই অল্পাধিক পরিমাণে নব্যবঙ্গ ব্যবহার করে। কিন্তু ভাবের ভঙ্গীর সহিত ভাষার তেমন ভঙ্গী, তেমন সতেজ গতি, বঙ্কিমের ন্যায় অন্য বঙ্গীয় গ্রন্থকারে দেখিনা। ওস্তাদের বিস্তর সাগ্রেদ হইয়াছে। কিন্তু ওস্তাদের সেই ওস্তাদিধরণটুকুর নিকটস্থ হইতে কেহই পারিতেছেন না। ভাষার আকুঞ্চন ও প্রসারণে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। এমন সময়োপযোগী শব্দবিন্যাস শক্তি আর কোন গ্রন্থকারেই দেখিনা। বঙ্কিমবাবু অতুল শব্দসম্পদের অধিকারী হইয়াও যৎপরোনাস্তি মিতব্যয়ী, শব্দের অপব্যয় কাহাকে বলে জানেন না। এমন 'বেপে খরচ' সাবধানে সন্তর্পণে কেহই ব্যয় করেন না, অথচ তিনি কৃপণও নহেন। যে স্থলে ব্যয়ের আবশ্যক সে স্থলে মুক্তহস্ত। তাঁহার লাবণ্যময়ী ভাষা ভাবের ভরে কখন হেলে, কখন দুলে, উঠে, পড়ে, ক্ষুরে, নাচে,—কখন মৃদুমধুর বীণাধ্বনি করে,—কখন জলদগম্ভীরস্বরে গর্জ্জিয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যে দিকে ফিরান সেইদিকে ফিরে। দুর্গেশনন্দিনীতে যে ভাষার সৃষ্টি—যাহার পূর্ণতেজ 'বিষবৃক্ষ' ও চন্দ্রশেখরে দেখিতে পাই—'দেবী-চৌধুরাণীতে' ঠিক সেইভাষা নহে। এই গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্রই অতি সহজ। সরলতার সার বাহির করিয়া উহাকে গঠন করা হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কোন মহদ্ভাবকে সৌকুমার্য্যতা প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে সে ভাব এইরূপ সহজ ভাষাতেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। দেবীচৌধুরাণীকাব্যের ভাষা ও ভাব উভয়ই মহাকাব্যোপযোগী।

নামনির্ব্বাচনে বঙ্কিমবাবু অদ্বিতীয়। তিনি এ পর্য্যন্ত যত কাব্য লিখিয়াছেন তাহার সকল গুলিতেই তাঁহার নাম নির্ব্বাচনক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম সর্ব্বথা সরল, চরিত্রপরিব্যঞ্জক এবং সময় ও অবস্থার উপযোগী। অনেকে বলিতে পারেন, "নামে কি করে? গুলাব যে নামে ডাক, গন্ধ বিতরে"। কথাটি হইলেও অনেক সময়ে ঠিক নয়। অনেক সময়ে নামের জন্য সৌন্দর্য্যের হ্রাস ও ভাবের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। 'দেবীচৌধুরাণী'কাব্যে নামনির্ব্বাচন চূড়ান্ত হইয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থ কাব্য ও নাটকাপেক্ষা উচ্চস্থানীয় ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে 'বঙ্কিম'প্রণীত কোন গ্রন্থসম্বন্ধে রসবিচারে চিত্তাকর্ষণক্ষমতার কথা বলা অনাবশ্যক। 'দেবীচৌধুরাণী' পড়িবার সময় আমরা অনেকস্থলে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, উহা সমালোচনা করিতে হইবে।

'চিত্তোৎকর্ষই ধর্ম্মের সারসত্ত্বা, উন্নতজীবনই ধর্ম্মের পরিণাম' এই কথা কয়টী 'দেবীচৌধুরাণীতে' প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অপিচ মনুষ্যের উন্নতিসম্বন্ধে ইহা সাধারণ নিয়ম যে,—সে যে পথই অবলম্বন করুক ক্রমশঃ ধর্ম্মের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইবে' ইহাও সমালোচ্য গ্রন্থে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিপাদিত। অগস্ত্য কোমতের উল্লিখিত মহাবাক্যের সার্থকতা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কাছে, নিজের জীবনে

পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হইতে দেখিতেছি। কবি ক্রমশঃ মনুষ্যজীবনের উচ্চতম সাধন—ধর্ম্মের দিকেই অধিকতর অগ্রসর হইতেছেন,

সাক্ষী—"আনন্দমঠ" ও "দেবীচৌধুরাণী"।

ঃ দঃ।

ছোট বউ।

ঐ——পাড়ার মাঝে, পূর্ণ সাজে,
ছোট ছোট বৌটি,—
তা'দের – কাহার কেমন, 'গড়ন পিটন'
জানিস তোরা কেউ?

তা'দের— সবাই সমান, হয় অনুমান,
বাহিরে যেমন সাজ,
ঘোমটা টানা যায় না জানা,
ভিতরে কেমন কায়।

আহা।— উঠনমাঝে, ঘুরছে কায়ে,
ঝাপিয়ে বসন গায়,
যদি —— দেখ্‌তে কেহ, দুলিয়ে দেহ
অমনি সরে যায়।

কলসী কাঁকে, নলক নাকে,
ঘোমটা ঢাকা মুখ,
কভু —— যাচ্ছে ঘাটে, বোল্‌ছে সাটে,
সাধের সোহাগটুক।

থাকে — ঢাকা-ঢোকা, লাজে মাখা,
বড়ই যেন ভয়,
প্রায় — কয় না কথা, যথা তথা,
মুখটী বুজে রয়।

কেবল — স্নানের কালে, ঘোমটা খুলে,
এলিয়ে পড়ে চুল।
আহা!— দেখ্‌তে তখন, একটী যেমন
আধ-ফুটন্ত ফুল!

আহা।— নাহিকো সোণা নাইকো দানা,
গহনা তেমন,
কিন্তু তবু এমন কভু
হেরে নি নয়ন।

আর এই—পাপজগতে, এদের হ'তে
পবিত্রজীবন;
এ বঙ্গে, কোন দেশে,
দেখিনি কখন।

তে মরা লজ্জাবতী, সাধ্বিসতী,
করি আশীর্ব্বাদ,—
ওগো — হওগো বুড়ী, পরিয়ে চুড়ী,
পুরুক মনের সাধ।

কিন্তু — আলাক মেরে, ঝগড়া করে
জলিওনাকো কাণ,
সদা — শান্ত হবে, সুখে রবে,
বাড়বে তাহে মান।

যেন — সংগোপনে, পতির মনে
দিওনা কভু 'ঘা',
আদর পাবে, শীঘ্র সবে,
হওগো পুতের মা।

কেবল = সকল স্থানে, ধর্ম্মপানে
তাকিয়ে কোরো কায,
মনটী ভাল হলেই হ'ল;
কায কি অত লাজ?

শুভানুধ্যায়িনী—জনৈক বৃদ্ধা প্রপিতামহী।

বঃকলম শ্রীবড়ানন্দ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

নানা কথা।

'বঙ্গদর্শনের' পতনে আমরা যেরূপ সন্তপ্ত, 'নবজীবনের' বিজ্ঞাপন সন্দর্শনে তাদৃশ উল্লসিত। 'নবজীবন' মাসিক পত্র, সম্পাদিত হইবে—সাধনীর সুযোগ্য সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার দ্বারা। 'নবজীবনে' যে সকল ব্যক্তি 'নিয়মিতরূপে' লিখিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই সাহিত্যসংসারে অল্পাধিক পরিমাণে পরিচিত। অতএব 'নবজীবন' জন্মিয়াই (ঈশ্বর না করুণ) যদি মৃত্যুমুখে পতিত না হয়,—ও উহার বিজ্ঞাপিত লেখকগণ স্বোপার্জ্জিত সুখ্যাতি-সংলব্ধ-মদালস পরিত্যাগ করিয়া—কায়মনোবাক্যে মাতৃভাষার আরাধনায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে বলা বাহুল্য যে, ভাবীসহযোগী সাধারণ্যে প্রতিপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। তবে অগ্রেই একটা কথা,—কথাটা বলাতে বোধহয় ধৃষ্টতা হইবে না। 'তীক্ষ্ণবুদ্ধি' সরকারমহাশয় তাঁহার 'নূতন মাসিকের' নামনির্ব্বাচনে আপনাকে বিশেষ ভাগ্যবান প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কেশববাবুর 'নববিধানের' পর হইতে বঙ্গসাহিত্যে 'নব, নব্য, নবীনের' খরচটা কিছু বেশী বেশী দেখিতেছি। কাহারই যেন আর পুরাতনে মন নাই,—সকলেরই নূতনের উপর 'ঝোঁক'—এ ঝোঁক অবশ্য কতকটা স্বাভাবিক; নূতন পেলে পুরাতন আর কে চায়? কেহ চায় না বটে,—কিন্তু অবিশ্রান্ত ক্রমাগত কেবলমাত্র নূতনের কারবার বাঁধিলে, 'নূতন নূতন' করিয়া চীৎকার করিলে, নূতনের নূতনত্ব পচিয়া উঠে, আর অর্থও বুঝা যায় না। তারপর সে দৃশ্যটাও বড় হাস্যকর হইয়া পড়ে। সেকরার দুইটা জিনিষ পুরাণ ভাল বলিয়া একটা লোকপ্রসিদ্ধ কথা ছিল,—খরতর নূতনের স্রোত ভাসিয়া সেটাও মুলুক ছাড়িয়া গিয়াছে। যাঁহার যখন ইচ্ছা হইতেছে,—বহুকালের পুরাতন দেশটাকে এক মিনিটের মধ্যে নূতন করিয়া তুলিতেছেন,—ব্যাপারটা কি আমরা বস্তুতই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কোনখানে কিছু নাই, জনৈক নবীন সম্পাদক জলদগম্ভীর স্বরে একদিন বলিয়া উঠিলেন "ভারত-ইতিহাস-লেখকগণ কলম ধরিয়া লিখুন,—১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন ভারত 'নব্য-ভারত' নামে অভিহিত হইল। পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে তবে পৃথিবী বুঝিবে" ইত্যাদি। যাহা বুঝিবার শক্তি পৃথিবীর আছে কি না সন্দেহ,—তাহা আমরা ক্ষুদ্রতম কীটানুকীট হইয়া কি রূপে বুঝিব? কাযেই বুঝিলাম না, অবাক—বিস্মিত—হইয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!! কোনখানে কিছু নাই, ঠিক দুপুরবেলা রাজা মান্ধাতার আমলের পুরাণ ভারতবর্ষ 'নব্যভারত' হইয়া মুচকি হাসি হাসিল। এই আকস্মিক ঘটনা—

ঐতিহাসিক কলম ধরিয়া স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিতে অনুরুদ্ধ হইলেন; কিন্তু ঐতিহাসিক কলম ধরিয়া লিখিবেন কি, হাত কাঁপিয়া কলম পড়িয়া গেল—তিনি নবীনার রূপ দেখিয়া আতঙ্কে আড়ষ্ট। যাহা হউক ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরাণ ভারত নব্য হইল। কিন্তু ১২৯১ সালের শ্রাবনমাসে এ আবার কি? এ বৎসর বঙ্গদেশের নবজীবন, এবারও মাসিক-পত্রের মারফত নবত্বের সমাগম। তবে সম্পাদক তাদৃশ কনীয়ান নহেন,—প্রবীন, সমীচীন—কিন্তু পুরাতন উদাসীনও নবীনের নিতান্ত অধীন কি জন্য বলিতে পারি না। তিনি 'নবজীবন দেখাইয়া 'বাঙ্গের নবযুগে নবোৎসাহে যোগ' দিবার জন্য বাঙ্গালীকে ডাকিতেছেন। বঙ্গের 'নবযুগ'। 'বাঙ্গালীর নবজীবন'।। এই 'নবযুগ'—'নবজীবন' অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিল? অথবা ঐ সকল শব্দের কিছুমাত্র অর্থ নাই?—কেবল আলঙ্কারিক আড়ম্বরের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে? স্বয়ং 'তর্কচূড়ামণি' মহাশয়ই বলিতেছেন, ভারতবাসী এখন ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাকেও কি 'নবজীবন' বলিতে হইবে? বঙ্গে হঠাৎ নবযুগের আবির্ভাব হওয়ার কিছুমাত্রও কারণ ত দেখিতেছি না। তবে সাধারণী চুঁচুড়া ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন আর 'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি' ধর্ম্মসম্বন্ধে কয়েকটা 'বক্তৃতা' করিয়াছেন। ইহাতেই যদি বঙ্গে নবযুগের আবির্ভাব ও নবজীবনের সঞ্চার হইয়া থাকে তাহাহইলে অবশ্য কথা নাই। কিন্তু সাধারণী-সম্পাদক চুঁচুড়া ছাড়িয়া আসিবার সময় বলিতেছেন যে, তাঁহার "চিরপোষিত আশা লতা ছিন্ন" হইয়াছে—"একদিকের পাঁচরা ধসিয়া" গিয়াছে—"মর্ম্মদগ্ধ" হইয়াছে। এত সমস্ত হইতে হইতে সেই মুহূর্ত্তেই আবার "নবোৎসাহ, উচ্চব্রত, উচ্চ-আশা দৃঢ়সংকল্প" প্রভৃতি দক্ষ সম্পাদকের শিরায় সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। যাহা হউক, সরকার মহাশয় তাঁহার অসুস্থ শরীর লইয়াও যে আর একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে বাস্তবিকই তিনি প্রশংসার্হ। তাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায় দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া চিরকাল এইরূপ দেশের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকুন।

আমরা 'নবজীবনের' সুপ্রসব ও সৌভাগ্য কামনা করি।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা লইয়া আজকাল সহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী তত্ত্ব কথায় মাতিয়াছে। কেহ কেহ এতদুপলক্ষে একটী হিন্দু ধর্ম্ম-সমাজ সংস্থাপন করিবার প্রস্তাবও করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, একটী প্রশস্ত-গৃহ নির্ম্মিত করাইয়া তথায় প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হউক। কিন্তু আমরা একপ মন্দিরের পক্ষপাতী নহি। আমরা জানি, এরূপে লোককে ধর্ম্মবিষয়ে উত্তেজিত করা যায় না। ধর্ম্ম অন্তরের সামগ্রী—প্রাণের সামগ্রী। আমার প্রাণ না চাহিলে, আমার মন ধর্ম্মভাবে না মাতিলে, আমি তোমার মন্দিরে উপদেশ শুনিতেই যাইব না। তখন তোমার মন্দিরে—তোমার উপদেশ প্রদানে আমার কি ফল? কিছুই নহে। আমরা অনেক

ব্রহ্মমন্দিরকেও এক্ষণে দেখিতে পাই যে সে গুলি ক্রমে আমোদের স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক 'ডবিসভা'ও এইরূপ বিকৃত আকারে পরিণত হইয়াছে। সমাজে বা সভায় গিয়া গান শুনিব, মজা দেখিব, এইরূপ অভিপ্রায়েই অধিকাংশ লোকে তথায় গিয়া থাকে। ইহাদের আবার অধিকাংশই অপরিণতবয়স্ক। তাঁহাদের বুঝিবার শক্তি ত অগাধ!—কিন্তু তর্ক করিবার ইচ্ছা ভয়ানক প্রবলা। "অমুক যে বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার কথার এ গুলা ঠিক নহে,—তিনি অমুক শ্লোকের—বা পাতঞ্জল-দর্শনের অমুক সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা নিতান্তই অসঙ্গত।" ইত্যাদি। আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক। কেহ হয়ত রঘুবংশের ৩।৪ সর্গ কি ভট্টির ৫।৭ খান পাত পড়িয়াছেন, কেহ বা কুমার কি নৈষধের ২।৪ খান পাতা উল্টাইয়াছেন কি না সন্দেহ. কেহ বা হয়ত সাংখ্য দর্শনের একটু সমালোচনের সমালোচন পড়িয়াছেন, অথবা বেদান্তাদির ইংরাজিতে অনুবাদ একটু দেখিয়াছেন,——ইহাতেই তাঁহারা ঘোরতর পণ্ডিত ও সমগ্র দর্শন-উপনিষদের সম্যক বিচারক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন! যাহা হউক, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা মন্দিরাদির দ্বারা বিশেষ ফললাভের আশা করিতে সাহসী হই না। যিনি প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবেন, তিনি নিজেই তাঁহার পথ খুঁজিয়া লইতে পারিবেন এরূপ অনেক সুবিধা আছে। আর যদি সাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, তবে হিন্দু-আচারানুসারে তাহার উপায়বিধান করাই সর্ব্বপ্রকারে সুখের। পূর্ব্বে অজ্ঞলোকদিগকে শাস্ত্রের স্থূলমর্ম্ম (কেন না তাহারা গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম) বুঝাইয়া দিবার জন্য স্থানে স্থানে "কথা" দেওয়া হইত, অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞগণকে ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় ব্যাখ্যা করিয়া আর্য্যধর্ম্মের সুধাপূর্ণ ভাব ও উপদেশসকল বুঝাইয়া দেওয়া হইত। বর্ত্তমানকালে এ সকল সম্পূর্ণ অসম্ভবও না হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অধিকসংখ্যক প্রচারক উত্থিত হইয়া (চূড়ামনিমহাশয়ের ন্যায়) বক্তৃতাদ্বারা হিন্দু আচারব্যবহারাদির প্রকৃত মর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্মের সারবত্তা বুঝাইয়া দেওয়াও আমরা মন্দ বলি না। যাহা আর্য্য, তাহা প্রকৃত আর্য্যভাবে হইতে দেখিলেই আমরা সুখী হই। তবে আমাদের সমাজ এক্ষণে যেরূপ ভাবে আছে, তাহাতে প্রকৃত আর্য্যভাব আসার পক্ষে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বারান্তরে বলিব।

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; শ্রাবণ, প্রথম পক্ষ। [একাদশ সংখ্যা।

যোগরহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

কুম্ভকাভ্যাস সুগম ও তাহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করিবার জন্য যোগীরা জিহ্বার নিম্নস্থক ছিন্ন করিয়া দেন। দুই চারি দিন নবনীত মর্দ্দন করিলেই ছিন্নস্থান শুকাইয়া যায়। অনন্তর সেই ছিন্নমূল জিহ্বায় নবনীত মাখাইয়া তাহা লৌহ আকোড়নীর দ্বারা আকর্ষণ করেন। কিছদিন এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহাদের জিহ্বা পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও পাতলা হইয়া পড়ে; সুতরাং তদ্দ্বারা তাঁহারা সহজেই সর্পাদিজাতির স্বভাব অনুকরণ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের প্রত্যাশা এই যে, জিহ্বাকে উক্ত প্রকারে বড় ও পাতলা করিতে পারিলে অমরাও ভেকাদিজাতির ন্যায় দীর্ঘকাল অনাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব। বস্তুতঃ ভেক ও সর্পাদিজাতির জিহ্বা স্বভাবতই দীর্ঘ, পাতলা ও সমধিক স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। শীতনিদ্রার সময় তাহা তাহারা উৎকর্ষণপূর্ব্বক কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করতঃ সুখে ও নিরশনে কালযাপন করে। উহা দেখিয়া যোগীরাও আপনাদের লম্বিতজিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা উপজিহ্বাকে চাপিয়া শ্বাসছিদ্রের অপ্রশস্তপথ রুদ্ধ করতঃ কুম্ভকাবিষ্ট হন। পরন্তু যাঁহাদের জিহ্বা স্বভাবতঃই লম্বা ও পাতলা,—তাঁহাদের জিহ্বার মূলস্নায়ু ছিন্ন করিতে হয় না; কিছু দিন চেষ্টা করিলেই তাঁহারা জিহ্বাকে সহজে অন্ননাসাপ্রদেশে বা কণ্ঠকূপে প্রবিষ্ট করিতে পারেন। যোগিগণ বলেন যে, এতদ্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ ধারণ করিয়া থাকা যায়। ইহাই কুম্ভকস্থায়িত্বের বিশেষ সহায় এবং যোগশাস্ত্রে ইহারই অন্য নাম খেচরী মুদ্রা।*

যোগীরা আরও বলেন যে, চতুর্বিংশতি বৎসর এতদ্রূপ কুম্ভকাভ্যাস করিতে পারিলে শরীরের সমস্ত শোণিত পয়োবৎ শুভ্রবর্ণে পরিণত হয়। তখন আর তাহার দেহে মানবীয় উপাদান থাকে না। তৎপরিবর্ত্তে কোন এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব উপাদান আবির্ভূত হয়। সেই জন্যই তাঁহাদের মানবোচিত ক্ষুধা, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, কিছুরই অনুভব থাকে না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মঙ্কনক নামা জনৈক ঋষি যোগচর্য্যায় রত ছিলেন। একদিন কুশধারে তাঁহার অঙ্গুলি কর্ত্তিত হওয়ার পর, কর্ত্তিতস্থান হইতে শাকরস নিঃসৃত হইল। তদ্দর্শনে তিনি হর্ষে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার বিস্ময়ভঙ্গের জন্য পরমযোগী সদাশিব তথায় আবির্ভূত হইলেন

* "ছেদনচালনদোহৈর্জ্জিহ্বাং সম্বর্দ্ধয়েত্তাবৎ।
যাবদ্ভ্রুবোর্মধ্যং স্পৃশতি তদা খেচরীসিদ্ধিঃ॥

এবং তিনি আপনার অঙ্গুলি ছিন্ন করিয়া ছিন্নস্থান হইতে শুভ্র ভস্মাকার রস নির্গত করিয়া দেখাইলেন। শরীরের শোণিত দুগ্ধবর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ বাঁচে, এ কথা আজকাল বলিবার যোগ্য না হইলেও বলিলাম। যোগিদিগের লেখা দেখিয়াই বলিলাম। আরও দুই চারিটী অবসরোচিত কথা বলিব, ভরসা করি, পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না।

শ্বাসপ্রশ্বাসের অল্পাধিক্য শরীরের উপর যে কত কার্য্য করে, কত ক্ষমতা বিস্তার করে, এক জন বিলাতী ডাক্তারের চিকিৎসা-বৃত্তান্ত শুনিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম বোধ গম্য হইতে পারে। ইয়ুরোপবাসী জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার, শস্ত্রচিকিৎসাকালে রোগীকে ক্লোরোফরম প্রভৃতি চৈতন্য-হারক ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া, অন্য একটী নূতন উপায় অবলম্বন করিতে বলেন। অর্থাৎ তিনি রোগীকে ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে বলেন। আরও বলেন, যেন প্রতিমিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা এক শতের (১০০) ন্যূন না হয়। রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়িত হইলে চিকিৎসক তাহার মুখ বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দেন, এবং নিকটে কোনপ্রকার বিকট শব্দ কি অন্য কোন উপদ্রব হইতে দেন না। ৭।৮ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই ঐ প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাহার স্নায়বিক উত্তেজনা উপশান্ত ও চৈতন্য লোপ হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের চৈতন্যহরণ করা কিছু সুসাধ্য। রোগী অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বে আপনার মস্তক কিছু ভার বোধ করে এবং তাহার মুখশ্রী কিছু রক্তিম হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার মুখ মলিন, বিবর্ণ ও তাহার হৃৎস্পন্দন মৃদু হইয়া আইসে। ডাক্তার হিউসন্ বলেন যে, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্য হরণ করিলে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই।

মনুষ্য উক্ত প্রক্রিয়ায় হতচেতন হয় কেন? তাহা বুঝিবার জন্য অনেক সুযুক্তি আছে। তাহার স্থূল স্থূল দুই একটী যুক্তির উল্লেখ করিলেই, বোধ হয়, পাঠকবর্গের কুতূহল নির্ব্বাপিত হইতে পারিবে। প্রথম যুক্তি এই যে, উপর্য্যুপরি ঘন ঘন শ্বাস টানিতে থাকিলে, রক্তের অম্লযান স্বল্প হইয়া পড়ে। সুতরাং ক্ষারযানের আধিক্য হইয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলকে ক্রমে বিযুক্ত করিয়া তুলে। কাযেই তাহার মস্তিষ্কও বিষক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। এই যুক্তিটী ডাক্তার হিউসনের সম্মত। ডাক্তার বন্ উইলও "ক্ষারযানের আধিক্যই চৈতন্যলোপের কারণ" বলিয়া উক্ত মতের পোষকতা করেন। কিন্তু এতদপেক্ষা, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসনির্ব্বাহ হওয়ায় তাহার মস্তিষ্কগত কৈশিকশিরাসমূহ রুধিরস্রোতে উপপ্লুত হইয়া উঠে, তন্নিবন্ধনই তাহার চৈতন্যলোপ হয়,—এই মতটী বোধ হয় অধিক সঙ্গত। ইচ্ছাপূর্ব্বক বা প্রযত্নসহকারে শ্বাসপ্রশ্বাস উত্থাপিত করিতে চিত্তের যে একাগ্রতা লাগে,—সেই একাগ্রতা যে নিদ্রাতুল্য সমাধির বা সংজ্ঞাবিষ্টত্বের কারণ নহে, এরূপ বলাও যায় না। যাহাই হউক, শ্বাসরোধের সহায়তায় যে কত শত অলৌকিক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হয়—তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শ্বাসরোধের সহায়তায় বাজীকরেরা অন্য একটী অদ্ভুত কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাও

বলা যাইতেছে। এক খানি চতুষ্কোণ দীর্ঘ বস্ত্রের চারিটী কোণ চারিদিক হইতে চারিজনে ধরিয়া রাখে। বাজীকর শ্বাস রোধপূর্ব্বক অনায়াসেই তাহার উপর দিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে দৌড়িয়া যায়। বস্ত্রে কিছু মাত্র ভার লাগে না। এমন কি, বস্ত্রে তাহার পদস্পর্শ হইল কি না তাহাও বোধগম্য করা যায় না। অনেকেই গল্প করেন যে, অমুকস্থানে এক যোগী আসিয়াছিল, সে খড়ম ও জুতা পায়ে দিয়া জলের উপর চলিয়া গিয়াছিল। যাঁহারা বাজীকরদিগের বস্ত্র পার হওয়া দেখিয়াছেন—তাঁহারা উক্ত জনরবকে কদাচ গল্প বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন না। কারণ, যে কৌশলে বস্ত্রের উপরে দৌড়িতে পারা যায়, সেই কৌশলেই জলের উপর দৌড়িতে পারা যায়।

প্রাণায়াম প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলা হইল। তাহাতে স্থির হইল যে, অভ্যাসই বলবান পদার্থ। অভ্যাস করিলে সিদ্ধ না হয় এমন কার্য্যই নাই। অভ্যাস করিলে স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অত্যধিককাল রুদ্ধশ্বাস ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াও থাকা যায়। তাহার দেহ তৎকালে এত লঘু হয় যে, নিষ্পিঞ্জিততুলরাশির ন্যায় শূন্যোপরি ভাসমান হইতে পারে। এ কথায় হয় ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, বায়ুই জীবের জীবন,—যাহা ছাড়া হইয়া জীব ক্ষণার্দ্ধও জীবিত থাকিতে পারে না,—প্রাণধারণের প্রধান উপকরণ তাদৃশ বায়ু অবরুদ্ধ থাকিবে, অথচ সে মরিবে না,—ইহা কিরূপ কথা? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সুসাধ্য নহে। রাশি রাশি শারীরশাস্ত্র সংগ্রহ করিলেও, উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

শ্বাসরোধপূর্ব্বক বহুদিন অনশনে থাকিলেও যোগীর যে প্রাণক্ষয় হয় না,—তদ্বিষয়ে অনেক কারণ আছে। সে সকল কারণ আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে অক্ষম। পরন্তু এ বিষয়ের দুই একটী নিদর্শন পাইলে বুদ্ধিমান্ পাঠক হয়ত উহার কার্য্যকারণভাব উহ করিয়া লইতে পারিবেন। সুদীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও যে শরীরবিনাশ হয় না, তাহা দীর্ঘনিদ্রা, সমাধি ও প্রণাঢ় চিন্তা,—এই তিনটী বিষয়ের সম্যক্ তথ্য অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ তিন ব্যাপার যে শরীরের উপর কি কি অদ্ভুত কার্য্য করে, তাহা বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

দীর্ঘনিদ্রা।—এরূপ শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন মানুষ হঠাৎ এরূপ নিদ্রালুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের কেহ এক মাস, কেহ বা ততোধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহাদের সেই দীর্ঘনিদ্রারূপ রোগের কারণনির্ণয় ও জাগ্রদবস্থা (চৈতন্য) আনয়নের নিমিত্ত অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাদৃশ নিদ্রারোগের স্থল নির্দ্দেশার্থ আমরা রামায়ণ-বিখ্যাত কুম্ভকর্ণের উল্লেখ না করিয়া কালের ঔচিত্য অনুসারে একজন ইয়ুরোপীয় লোকের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ শুনা গিয়াছে, "টিষবরি" নামক স্থানে "বিল্‌টন" নামক জনৈক শ্রমজীবী মনুষ্য অবিচ্ছেদে মাসাধিক কাল নিদ্রাভিভূত থাকিত। তাহার এরূপ অভ্যাস হইয়াছিল যে, সে আপনার তাদৃশ

দীর্ঘনিদ্রার মধ্যে জলবিন্দুও পান করিত না। অথচ তাহার শরীরের স্থূলতা ও লাবণ্যাদি সমস্তই যথাযোগ্য ও অব্যাহত ছিল। ইংরাজদিগের লেখনীমুখে আমরা এরূপ অনেক দীর্ঘনিদ্রার বা নিদ্রারোগের সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু কোনও নিদ্রিতকে কখন অনাহারে কৃশ হইতে শুনি নাই। বস্তুতঃ প্রগাঢ় নিদ্রার প্রভাব (অজ্ঞাতশক্তি) যে শরীরের উপর কি কি কার্য্য করে ও কি কি কার্য্য করে না,—তাহা কে বলিতে পারে? মোটামোটা আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে কারণে দীর্ঘনিদ্রাকালে ক্ষুদ্বোধ থাকে না, যোগীর সমাধি কালেও সেই কারণেই ক্ষুদ্বাধা বিনিবৃত্ত থাকে। অতএব যোগীর সমাধি আর নিদ্রারোগীর প্রগাঢ়-নিদ্রা প্রায় তুল্য কার্য্যকারী।

প্রগাঢ় চিন্তা।—ইনি একজন ক্ষুধামান্দ্যের মহাগুরু। যাঁহারা সদাসর্ব্বদা চিন্তারত থাকেন—তাঁহারা অধিক ভোজন করিতে পারেন না। করিলেও তাহা তাঁহাদের পরিপাক হয় না। দেহকে কৃশ ও নিস্তেজ করিতে এমন আর কেহই নাই। সত্য বটে, 'চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাম্'।- চিন্তার দ্বারাই মনুষ্য জীর্ণ, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। সত্য বটে, চিন্তার প্রভাবেই মনুষ্য ক্ষুদ্বোধে বঞ্চিত থাকে। তজ্জন্য তাহারা রুগ্ন, ভগ্ন ও কৃশ হয়। পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিচার্য্য আছে। সকল চিন্তা ও সকল চিন্তার ফলাফল সমান নহে। উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক চিন্তা হইলে তাহা শরীরের নাশক হয়, সরস চিন্তায় শরীরের নাশ হয় না। অথচ তাহা ক্ষুদ্বোধের নিবারক হয়। একজন বৃদ্ধ বৈদ্য (চরক) শরীরপুষ্টিসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—

"অচিন্তনাচ্চ বার্য্যাণাং ধ্রুবং সম্পূরণেন চ।
স্বপ্নপ্রসঙ্গাচ্চ নরোবৃংহণ হর্ষ পুষ্যতি॥"

মনুষ্যের যদি চিন্তা (উৎকণ্ঠা পূর্ব্বক অধ্যান) না থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি যদি পরিতৃপ্ত থাকে, তৎসঙ্গে যদি সুনিদ্রা থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মনুষ্য বর্ষাকের ন্যায় স্থূল বা পরিপুষ্ট হয়। অতএব বার্য্যচিন্তাই শরীরের নাশক। অবশ্য পুরুষের যে আত্মচিন্তা অথবা সুখবিশেষের অনুধ্যান থাকে,—তাহা তাহার শরীরের সেরূপ নাশক নহে। কেননা বার্য্যচিন্তাই চিন্তা, আত্মচিন্তা চিন্তা নহে। যেমন "অহমো বিষ্ণুরমোবা" ঈশ্বরপ্রীতিবাসনা কামনামধ্যে গণ্য নহে, তদ্রূপ আত্মানুধ্যানরূপ চিন্তাও চিন্তা বলিয়া গণ্য নহে। সেই জন্যই লোকে কার্য্যচিন্তাবর্জ্জিত ব্যক্তি দেখিলে তাহাকে নিশ্চিন্ত পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করে। এ সম্বন্ধে অন্য এক সিদ্ধান্ত কথা এই যে, কার্য্যচিন্তাই হউক, ঈশ্বরার্পিতচিত্তরূপ চিন্তাই হউক, আর সুখবিশেষের অনুধ্যানই হউক, ধ্যান বা চিন্তা মাত্রেই ক্ষুধানাশক। মনুষ্য যখন কার্য্যচিন্তায় রত থাকে, অথবা কোন অনির্ব্বচনীয়সুখে নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাদের ক্ষুদ্বোধ থাকে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা। পরন্তু তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, কার্য্যচিন্তায় চিত্তের ও দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়, কিন্তু পরমাত্মচিন্তায় ও সুখবিশেষের চিন্তায় তাহা হয় না। চিত্ত যদি তৃপ্তরসে পরিপূর্ণ থাকে ত তদবস্থায় শরীরও ক্ষয়োদয়রহিত থাকে। এ কথা বোধ হয় কোনও ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যোগীর সমাধিতেও, বোধ হয়, কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস প্রবাহিত থাকে, সেই জন্যই

তাঁহারা অনাহার করিয়াও কৃশ হন না, অথচ জীবিত থাকেন।

দীর্ঘচিন্তার দ্বারা ক্ষুদ্রাধার নিবৃত্ত হয়,—এতৎপ্রসঙ্গে এস্থলে আরও একটী গুরুতর কথা বলিতে হইল। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি যৎসামান্য চিন্তা (ধ্যান) উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তৎসঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হয়। অঙ্গচেষ্টা সকল শিথিল, অবয়ব কৃশ ও বিবর্ণ, দৃষ্টি স্থির ও বৈলক্ষণ্যযুক্ত হয়। চিত্তও তখন অপেক্ষাকৃত তন্ময় হইয়া পড়ে। শরীর যখন সামান্যচিন্তার বলে উক্তবিধ পরিণামের অধীন হইয়া পড়ে তখন যে, সে উৎকট চিন্তার বলে কোন রূপ উৎকট পরিণামের অধীন হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। উৎকটচিন্তা বা প্রগাঢ়ধ্যান সমভাবে ও সমবলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে যে শরীরের কি কি পরিবর্ত্তন হয় ও হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাধ্য। ঈদৃশস্থলে মনস্তত্ত্ববিৎ বা প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ যোগীরা বলেন যে, ধ্যান যদি অচ্ছিদ্র বা অনন্তরিতরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়,—চিত্ত যদি ধ্যেয় সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে,—তাহা হইলে তাহার শরীরও ক্রমে, হয় তদাকার (ধ্যেয়বস্তুর আকার) প্রাপ্ত হইবে, না হয় অন্য কোন আকারে পরিণত হইবে। এই সিদ্ধান্তটী উত্তমরূপ হৃদ্‌গম্য করাইবার নিমিত্ত তাঁহারা তৈলপায়িকা নামক পতঙ্গের ভয়জনিত ধ্যানের প্রভাব বর্ণন করিয়া থাকেন। তৈলপায়িকা (আর্শুলা বা তেলাপোকা) কাঁচপোকাকে (কুমুরকে পোকাকে) অত্যন্ত ভয় করে। কাঁচপোকা যদি তেলাপোকাকে একবার স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার অব্যাহতি নাই। সে ভয়ে এমন অভিভূত হয় যে, সে মরিয়াছে কি জীবন্ত আছে, তাহা জানা যায় না। ক্রমে ৮।১০ দিনের মধ্যে তাহার শরীরভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রায় সেই কাঁচপোকার আকার হইয়া যায়। কাঁচপোকার আকার হয় কেন? না, কাঁচপোকার স্পর্শাবধি নিরন্তরই তাহার চিত্ত ভয়ে উচ্ছিন্ন ও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল,—তন্ময় অর্থাৎ কাঁচপোকার আকারে পরিণত হইতেছিল,—সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সেই ভয়জনিত ধ্যানের প্রভাবেই তাহার চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়ায় তৎক্রমে তাহার শরীরও কাঁচপোকার আকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে।*

---

* তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়, একথা শুনিয়া হয় ত অনেক পাঠক হাস্য করিবেন। তাঁহাদের সেই চাপল্যপ্রভব হাস্য নিবারণ করাইবার জন্য আমরা একটী হাস্যকর ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। ইতিহাসটী ১২৯০ সালের বৈশাখমাসের প্রবাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণের সুবিধার্থ তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম:—

'জীবন্ত পাথরের মানুষ।—প্রাণিগণের অস্থি কালে প্রস্তরীভূত হয়। ভূগর্ভে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সজীব মনুষ্যের অস্থিসমূহও প্রস্তরীভূত হয়, একথা অতি বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। ডব্‌লিন নগরের কৌতুকাগারে (মিউজিয়মে) এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রমাণ আছে। বর্ক নামক নগরবাসী ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তি সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় সে বহুদিন জীবিত ছিল। যাহারা ক্লার্ককে জানিত তাহারা সকলেই বলিয়াছে যে, এই অদ্ভুত পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে ক্লার্ককে সবলে ক্ষিপ্রকারী ও বলশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিত। একরাত্রে ঘোরতর সুরাপানাদি অত্যাচারের পর ক্লার্ক মঠে পড়িয়াছিল। উত্থানকালে ক্লার্ক বুঝিতে পারিল, তাহার শরীর কেমন অবশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ক্রমে ক্লার্কের চক্ষু, চর্ম্ম ও অঙ্গাদি ক্রমশঃ

ভয়জনিত ধ্যানের ন্যায় কামজনিত, দ্বেষজনিত এবং স্নেহ বা প্রীতিজনিত ধ্যানও হয়। সেই সেই ধ্যানে চিত্তও তন্ময় হয় এবং তন্ময়তানিবন্ধন তাহাদের দেহও অন্যথা হইয়া যায়। ভয়, কাম, দ্বেষ ও স্নেহ প্রভৃতি যদি ঈশ্বরের প্রতি উৎকট বা প্রগাঢ় হইয়া পড়ে,—তাহা হইলে সে মোক্ষপদ পাইতে পারে। এই অভিপ্রায়েই ভাগবত পুরাণে কামভাবে গোপীগণের, ভয়ে কংসের, দ্বেষহেতুক শিশুপাল প্রভৃতির মোক্ষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে।*

যোগীরা আরও এক অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন, তাহাও এস্থলে ব্যক্ত করা আব-

---

সকলই প্রস্থানভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সাহায্য বিনা আর বসিতে উঠিতে পারে না এবং পরিশেষে দেহ আর কোন দিকে নত বা বর্দ্ধিতও পারিত না। দাঁড় করাইয়া দিলে বরং দাঁড়াইতে পারিত কিন্তু নড়িবার চেষ্টা করাও তাহার সাধ্যাতীত হইয়াছিল। তাহার দুই পাটী দাঁত একে ভাঙ্গিয়া একখান হইয়া গিয়াছিল। তরল খাদ্য তাহার উদরে চালাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া ফাঁক করা হইয়াছিল। তাহার রসনা স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হইয়াছিল এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে সে আর চক্ষেও দেখিতে পাইত না। ডব্লিনের কৌতুকাগারে ব্লাকের প্রস্তরীভূত দেহ সযত্নে রক্ষিত আছে।"

প্রাচীন গ্রীসের দেবতত্ত্বমধ্যে এতাদৃশ কাহিনী এক আধটা শুনা যায়। আমাদের দেশে গৌতম পত্নী অহল্যা বহুকাল পাষাণী হইয়াছিল। পাষাণ ভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অবশ্যই ইহাদের কোন উৎকট মনোবিকার বা চিত্তাবেগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তাহাদের মানবীয় উপাদান নষ্ট (ডিকম্পোজ) হইয়া গিয়া নূতন এক প্রকার গঠন উপস্থিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

* "কামাৎ গোপ্যোভয়াৎ কংসোদ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাত্ত্বং বয়ং বিভো।" (ভাগবত)।

শুষ্ক বোধ হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান ভৌতিক চক্ষু ছাড়া অন্য একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। সেই জন্যই যোগীরা তাহাকে যোগানুষ্ঠান দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যমান চক্ষুর দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থবিষ্ঠ বাহ্য-বস্তু দেখা যায়, সূক্ষ্ম বা কোন আভ্যন্তরীণ বস্তু দেখা যায় না। পরন্তু সেই প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাদৃশ তৃতীয় চক্ষুর শাস্ত্রীয় নাম—দিব্যচক্ষু, আর্ষবিজ্ঞান, জ্ঞানচক্ষু ইত্যাদি। সেই চিন্ময় বা জ্ঞানময় তৃতীয়চক্ষুর গোলোক অর্থাৎ আশ্রয়স্থান ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাটভাগের অভ্যন্তর। ললাটাভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে, ইহা জানাইবার জন্যই আমাদের পরমযোগী সদাশিব ত্রিনেত্র এবং শিবানীও ত্রিনেত্রা। যোগী হইলেই সেই তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে, নচেৎ হইবে না,—ইহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। তাঁহার বাহ্যচক্ষুর্দ্বয় অর্থাৎ নীচের দুই চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত কেন? তাহাও বলিতেছি। তাঁহার আঁখি ধুস্তূরপানে ঢুলুঢুলু নহে। তৃতীয় চক্ষু সর্ব্বক্ষণ বিকসিত থাকায় তাঁহার দিদৃক্ষাবৃত্তি (দর্শনেচ্ছা) আর নিম্নচক্ষে আইসে না। প্রত্যুত নিম্নচক্ষুর সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই ঊর্দ্ধচক্ষেই যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার নিম্নচক্ষু নিষ্ক্রিয়ের ন্যায় অর্দ্ধনিমীলিত ও ঢুলুঢুলু হইয়াই থাকে। তুমিও যদি ধ্যানী হও, জ্ঞানী হও, তোমার

রও যদি তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয়, ত তোমারও দৃশ্যমান চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে অর্দ্ধনিমীলিত ও ঢুলুঢুলু হইয়া আসিবে।

দৃশ্যমান স্থূলচক্ষুর দ্বারা দেখা, আর অদৃশ্যমান তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দেখা, তুল্য-প্রণালীক নহে। অত্যন্ত প্রভেদ আছে। যেরূপ ক্রমে বা যেরূপ প্রণালীতে তাঁহারা তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা বস্তু দর্শন করেন—তাহা তাঁহাদের মৌখিক সংবাদে জানা যায়। সেই সংবাদটী কিরূপ? তাহা শুনঃ—

যোগীরা বলেন যে, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করতঃ সমুদায় দিদৃক্ষা-বৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাটাভ্যন্তরস্থ চিদ্ভবের উপর অর্পণ করি। তদ্বারা চিত্ত তখন একতান হয় এবং ভৌতিক-চক্ষুর সমুদায় শক্তি তখন সেই একাগ্রীকৃতচিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। অর্থাৎ আমরা প্রবল ইচ্ছা শক্তির দ্বারা ভৌতিক-চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক-ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায়কে পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত, বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের চিত্তস্থান অর্থাৎ ললাটাভ্যন্তর যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। অর্থাৎ তথায় এক প্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। সেই আলোকে আমরা পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বা দিদৃক্ষিতবস্তুসকল অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্তস্থানে যাইতে হয় না; তাহা আমরা এই ললাটমধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞানময় তৃতীয়-চক্ষুর দ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (যাহার মধ্যে ব্যবধান আছে), বিপ্রকৃষ্ট (বহুদূরস্থ),—সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।

এতাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার অর্থাৎ যোগসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, বিবিধ অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা অনুভূত হইতে থাকে—বিবিধ অমানুষ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে কখন দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, কখন দেবানুচরদিগের ছায়া, কখন ইষ্টদেবতার প্রতিমূর্ত্তি, কখন দিব্যগন্ধ, কখন বা দিব্যবাণী (দৈববাণী,) কখন বা দিব্যনিনাদ উত্থিত হয়। দেহাভ্যন্তরে কখন ঘণ্টানিনাদ, কখন বেণুবীণাদির শব্দ, হৃদাকাশে কখন ইষ্টদেবতার বা উপাস্যদেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সে সকল ব্যাপার সত্য? কি, ভক্তির ছলনা? তাহা আমরা জানি না। এতৎসম্বন্ধে সার উপদেশ এই যে, যখন দেখিবে যে, উক্ত প্রকার অলৌকিক বা অমানুষ কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন জানিবে যে, তোমার সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সেই সকল অমানুষ বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভীত হইও না; মুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বা জাগ্রৎভ্রম মনে করিও না। বায়ুরোগ বা মস্তিষ্কবিকার বিবেচনা করিও না। বরং দৃঢ়তাসহকারে সমধিক উৎসাহী, সমধিক

আনন্দিত ও যোগবলের প্রতি সমধিক বিশ্বস্ত হইও।' তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার তৃতীয় চক্ষু বিকসিত হইবে, শীঘ্রই তোমার অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইবে।

যোগিদিগের এই কথা—এই উপদেশ—কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। যাঁহারা কোন সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা কোন দুরূহ সাধনার্থ সদাসর্ব্বদা ধ্যানরত থাকেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন পরীক্ষা করিয়া বা অনুভব করিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের সেই সেই চিন্তার ফললাভকালে কোনরূপ আলোকোদয় অনুভূত হয় কি না। আমাদের বিবেচনা হয় যে, তাঁহাদেরও ললাটাভ্যন্তরে যৎকিঞ্চিৎ আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। লৌকিক পুরুষের লৌকিক-বস্তু ধ্যানের ফললাভকালেও ললাটাভ্যন্তর যে কিছু না কিছু প্রদীপ্ত হয়, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

প্রসঙ্গাগত কথায় উন্মত্ত হইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়াছি সত্য, পরন্তু উদ্দেশ্য হারা হই নাই। অতএব এক্ষণে স্বল্পাহার সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিব, অবশেষে পূর্ব্বগৃহীত পথে গমন করিব।

স্বল্পাহার।—মনুষ্যের দৈনন্দিন শ্রমাদির দ্বারা যে দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হয়—দৈনন্দিন আহারাদির দ্বারা তাহা আবার পরিপূরিত হয়। যাহাদের শ্রমাদি অল্প—তাহারা অল্পভোজী। আর, যাহারা বহুপরিশ্রমী—তাহারা বহুভোজী। এক জন কৃষকের আহারের সহিত একজন শ্রমবিমুখ ভদ্রলোকের আহার তুলিত করিয়া দেখিলেই উক্তসিদ্ধান্ত সপ্রমাণ হইতে পারে। অতএব শ্রমাদির অল্পতাই যখন স্বল্পক্ষয় ও স্বল্পাহারের কারণ, তখন ভাবিয়া দেখ, যোগীর দৈহিক ক্ষয়ের ও তৎপূরণার্থ আহারের কি পরিমাণ কারণ সন্নিহিত আছে। প্রায়সর্ব্বক্ষণই তাঁহারা নিশ্চলভাবে নিদ্রাভিভূতের ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের অভ্যন্তর সাত্বিক আনন্দে পূর্ণ থাকে। সুতরাং তাঁহাদের দৈহিকক্রিয়াও উপশান্ত বা স্তম্ভিত থাকে। এরূপ স্থলে তাঁহাদের অনাহারজনিত দৈহিকক্ষয়ের সম্ভাবনা কি? প্রথম প্রথম তাঁহাদের অল্পমাত্র ভোজনের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু যখন তাঁহাদের সমস্ত দৈহিকক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে উপশান্ত বা স্তম্ভিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আহারের প্রয়োজন হয় না। শরীর নিশ্চল, চিত্ত আনন্দপূর্ণ ও রসবাহী থাকায় তাঁহাদের দৈহিকক্ষয় হয় না, সুতরাং তৎপূরণার্থ আহারেরও প্রয়োজন হয় না। এমন কি, সে অবস্থায় তাঁহাদের শ্বাসরোধজনিত মৃত্যুও হয় না।

শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা দেহের অশেষ উপকার সাধিত হয় বটে, শ্বাসপ্রশ্বাস এই মলমূত্রদেহের মার্জনীস্বরূপ বটে,—দেহের যে কিছু মালিন্য, যে কিছু বিকৃতি যে কিছু দূষিতপদার্থ, সমস্তই উহার দ্বারা নিরাকৃত ও শোধিত হয় বটে,—পরন্তু যে স্থলে শ্রমাদির অল্পতাহেতু আহারাদির স্বল্পতা থাকে, সে স্থলে সেরূপ দেহে অধিকপরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় না। যে যৎকিঞ্চিৎ দুষ্ট পদার্থ জন্মে, শ্বাসরোধহেতু তাহা তাঁহার দেহেই থাকিয়া যায়। সেই আবদ্ধ ও ক্রমসঞ্চিত দূষিত বস্তুর এমন কোন অজ্ঞাত শক্তি থাকিতে পারে—যদ্দ্বারা তাঁহার চৈতন্যহরণ অথচ জীবিত থাকা অসম্ভব হয় না। শরীরের দূষিত পদার্থ শরীর হইতে

বহির্গত হইয়া না গেলে শরীরে ও তৎসংসৃষ্টচিত্তে যে বিবিধ বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়,—বোধ হয়, তাহা কেহই অবিশ্বাস করিতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষুধা কি? তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেন না, ক্ষুধার প্রকৃততথ্য ও যথোচিত স্বভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, বোধ হয়, যোগিগণের অনশন জীবনের প্রতি বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে। ক্ষুধা কি? উহা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? উহার উপাদানই বা কি? এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সুকঠিন। তথাপি আমরা এতৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন, ক্ষুধা এক প্রকার স্পৃহা বা ইচ্ছোদ্রেকমাত্র। সেই উদ্রেকের দ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরক খাদ্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারি। শ্বাসপ্রশ্বাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন,দিজনিত দৈহিক উপাদানের ক্ষয় হইলে তাহা আমরা ক্ষুধার দ্বারাই জানিতে পারি। সেই সময় যদি আমরা শরীরে খাদ্যপ্রয়োগ না করি, সেই উদ্রিক্ত স্পৃহাকে অর্থাৎ বুভুক্ষাকে যদি আমরা খাদ্যপ্রয়োগদ্বারা বিনিবৃত্ত না করি, তাহা হইলে সেই ক্ষুধা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে যাতনা প্রদান করে, অবশেষে প্রাণবায়ুকেও এই দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেয়।

এই সিদ্ধান্ত যে কতদূর সঙ্গত—কতদূর যুক্তিযুক্ত—তাহা আমরা উত্তমরূপ বুঝিতে পারি না। কেননা তামাক অহিফেণ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্য—যাহাতে কিছুমাত্র শরীরপোষক বস্তু নাই—সেই সকল দ্রব্যের দ্বারাও আমরা অনেক সময়ে ক্ষুদ্বাধা নিবারিত করিতে দেখিয়াছি।

খাদ্যের অভাব হইলেই ক্ষুধা জন্মে। ইহা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, খাদ্যের অভাবই ক্ষুধার উপাদান কারণ। এসম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ক্ষুধার সময় জঠর শূন্য ও তাহার উভয় পার্শ্বের ত্বক্ আকুঞ্চিত ও পরস্পর ঘর্ষিত হইতে থাকে। সেই ঘর্ষণই ক্ষুদ্-যাতনা। এ মত কতদূর সত্য? তাহা দুই চারি প্রমাণের দ্বারাই নির্ণীত হয়। ১ম,—ক্ষুধা অনুভব হইবার অনেক পূর্ব্বেই জঠর শূন্য হয় অথচ তখন ক্ষুদ্‌যাতনা অনুভূত হয় না। ২য়—অনেক রোগীকে অনেক সময়ে মাসাধিক কাল শূন্যজঠরে থাকিতে দেখা গিয়াছে অথচ তাহারা কিছুমাত্র ক্ষুদ্বাধা অনুভব করে নাই। অনেক উন্মাদ দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে অথচ তাহারা কিছুমাত্র কাতর হয় না। ৩য়—অনেক শোকাভিভূত লোকের ক্ষুধা থাকে না, প্রত্যুত তাহারা ভোজনকে অতি দুষ্কর জ্ঞান করে।*

* নদীয়া জেলার অন্তর্গত "দামুর হুদো" নামক গ্রামে একটি স্ত্রীলোক ছিল। সে কিছুমাত্র পানভোজন করিত না। অথচ তাহার শরীর সুস্থ ও লাবণ্যযুক্ত ছিল। অনেক নীলকর সাহেব ও অনেক বাঙ্গালী তাহার সেই অদ্ভুত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার সেই অনশন-ব্রতের সম্বন্ধে জনরব এই যে, স্ত্রীলোকটী বিধবা হইলে ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত শোকে অভিভূত ছিল। পানভোজন দূরে থাকুক, একাল পর্য্যন্ত সে শয্যা হইতেও উঠে নাই। ক্রমে ক্রমে শোক, হ্রাস হইয়া আসিলে তাহার আহারে ইচ্ছা জন্মিল। আহার করিল,' কিন্তু তাহা উদরস্থ হইয়া থাকিল না, বমন হইয়া গেল। পরদিবসও

ক্ষুধা সম্বন্ধে অন্য এক প্রবাদও আছে। যে সকল ঔদর্য্য-রসে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হয়, বৈদ্যেরা যাহাকে জাঠরাগ্নি বলেন, সেই রস খাদ্যের অভাবে জঠরকে জীর্ণ করিতে থাকে। তদ্রূপ প্রকারে জঠরকে জীর্ণ হওয়া অতি ক্ষুদ্‌যাতনা অনুভূত হওয়া তুল্য কথা। এ প্রবাদ সুসঙ্গত হইত—জঠরে যদি ঐ রস সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা নির্ণীত হইত। ডাক্তারেরা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ রস জঠরে প্রস্তুত থাকে না। খাদ্য নিক্ষিপ্ত হইলে পর তাহারই উত্তেজনায় উহা উৎপাদিত ও নিঃসারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ রস আদৌ নিঃসৃত হয় না। স্তনে দুগ্ধসঞ্চয় হইলে তাহার বিস্তারস্থলে যেমন প্রথম হর্ষজনক চেতনা, অবশেষে তাহাতে বেদনাবিশেষ অনুভূত হয়,—সেইরূপ পাচকরস জঠরকোষে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখদায়ক হয়, পশ্চাৎ তাহা আবদ্ধ হওয়ায় বেদনাদায়ক হয়। একথা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহা বুঝা যায় না। পাচকরস যে স্তন্যপদার্থের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া আপন আপন কোষে আবদ্ধ হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অত্যন্ত ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্য পিচকারীর দ্বারা নাভিমধ্যে প্রপূরিত করিয়া দিলেও ক্ষুধার শান্তি হয়। ক্ষুধাসম্বন্ধে অপর এক মত আছে—তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝি না। ক্ষুধা একপ্রকার চেতনা। উহা সর্ব্বশরীরব্যাপিনী হইলেও তাহার গোপক অর্থাৎ প্রকাশস্থান জঠর। শ্রান্তির দ্বারা সমস্ত শরীর অবসন্ন হইলে যেমন চক্ষুতে নিদ্রার আবেশ হয়, শ্রান্তিসম্ভূত সর্ব্বশরীরব্যাপিনী চেতনাও তেমনি জঠরপ্রদেশেই আবির্ভূত বা প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধা নাম ধারণ করে।

এই সকল মতের মধ্যে কোন মত সত্য—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ ক্ষুধার স্বভাব অতি দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই বহুজনে বহুপ্রকার অনুমান করেন। যিনি যতই বলুন, কেহই যখন ক্ষুধাশান্তির প্রকৃত কারণ বা নির্দ্দিষ্টকারণ নির্ণয় করিতে পারেন না—তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে যোগবিশেষকে ক্ষুধাশান্তির কারণতাপক্ষে বিশ্বাস করিতে হইবেই হইবে। উন্মত্তেরা, জ্বরিতেরা ও শোকাতুরেরা যখন দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিতে পারে—তখন ধ্যান-যোগীরা যে তাহা পারেন না—এ কথার কোন অর্থ নাই। নাভির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইলে যদি ক্ষুধার শান্তি হয় ত তালুমধ্যে জিহ্বাগ্র প্রবিষ্ট রাখিলে তাহার শান্তি না হইবে কেন? বস্তুতঃ ক্ষুধা ও তন্নিবৃত্তির মধ্যে যে কি অদ্ভুত ও নিগূঢ় কার্য্যকারণভাব আছে—তাহা অস্মদাদির অবোধ্য। যোগীরা বলেন যে "কণ্ঠকূপে সংযমাৎ ক্ষুৎপিপাসাজয়ঃ" আমরা যখন চিত্তকে কণ্ঠকূপে নিমগ্ন রাখিয়া সমাহিত হই—তখন আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই থাকে না। যাহাই হউক, প্রোক্ত উদাহরণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা কোন ক্রমেই যোগি-

---

ঐরূপ হইল। প্রতিদিন যখন বমি হইতে লাগিল, তখন সে আহার পরিত্যাগ করিল। আহারপরিত্যাগ অবধি সে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল এবং বিশেষ কোন রোগগ্রস্ত হয় নাই,—বলহীন বা কৃশও হয় নাই। প্রতিদিন স্নান করাতে তাহার একবার কি দুইবার মাত্র প্রস্রাব হইত, মলচেষ্টা হইত না। এই রমণী বাঙ্গালা ১২৮০ সালেও জীবিতা ছিলেন।

গণের অনাহার জীবনে অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের যে কি অসীম ক্ষমতা আছে, এবং মন যে কখন কিরূপ কারণ অবলম্বন করিয়া শরীরকে কখন কিরূপ করিয়া তুলে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, অতঃপর আর আমরা মুখ-দোষী হইতে ইচ্ছা করি না। 'যোগ' উপলক্ষ্যে আমরা অনেক কথাই বলিলাম এবং অনেক চাপল্য প্রকাশ করিলাম। আমরা যখন যোগী নহি, কখনও কোনরূপ যোগযাগ করি নাই; দেখিও নাই, তখন যোগের কথা বলায় আমাদের চাপল্য-প্রকাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাও বলিতেছি যে, এ সকল কথার একটীও আমরা উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলি নাই। এ সমস্তই পরের কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগীরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদমাত্র আপনাদিগের সমক্ষে অর্পণ করিতেছি, সুতরাং আমরা ইহার দোষ-গুণের ভাগী নহি।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীক লীবর বেদান্তবাগীশ।

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম।

(সমালোচন)।

(১)

অদ্য আমরা বঙ্গসাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু কাব্য কি সম্যক্ প্রকারে সমালোচিত হইবার সামগ্রী? কবি-হৃদয়ের অনন্তভাবের অনন্ত-উচ্ছ্বাস কেহ কি আপন হৃদয়ে অনুভব করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম? কবি স্বয়ংই কি আপন হৃদয়ভাব সকল সময়ে অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ? কবির হৃদয়ে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা প্রকাশ করিবার হয় ত উপযুক্ত শব্দও নাই। যে সকল প্রচলিত শব্দে তাহা প্রকাশিত হয় তাহার দ্বারা দর্পণের প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্যহৃদয়ে সেই সকল ভাবের সমভাব উৎপন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব। কেন না কবি স্বভাবতই কবি,—শিক্ষাদ্বারা কবি নহেন। চিত্রকরের হৃদয়ে যে চিত্র জাগরিত আছে, বর্ণের দোষে বা চিত্র প্রতিফলিত করিবার দোষে তাহা যেমন অন্যের চিত্তগত করা দুরূহ, কবি-হৃদয়ের অনন্ত ক্রীড়াময় ভাবসকলও তেম-

* শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১ এক টাকা।

নই প্রকাশোপযোগী ভাষার দোষে বা প্রকাশ করিবার দোষে অন্যকে সম্যক্ অবগত করা দুরূহ। সুতরাং কবি হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া যে ভাবের অনন্তপ্রবাহ বহিতে থাকে তাহা সমালোচকের অকবি হৃদয়ের অননুভবনীয়। সমালোচক স্বয়ং কবি হইলেও কতকাংশে অননুভবনীয়, কেন না, এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের সম্যক বোধ্য নহে। ওই চিন্তাস্রোত বাক্যদ্বারা কথঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয়, সুতরাং কবির বাক্যের দ্বারা অসমান হৃদয়ে কখনই কবির হৃদয়ভাব সম্পূর্ণ অনুভব করা যাইতে পারে না। যাহা যৎসামান্য অনুভবনীয়, তাহা আবার অন্যের চিন্তাকে প্রবাহিত করিয়া অন্যের বাক্যে প্রকাশিত হইলে কবি হৃদয় হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়ে। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, অনন্ত প্রসারিত অনন্ত-গগণ-বিহারী কবি হৃদয় হইতে যে ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া চিন্তাস্রোতকে আলোড়িত বিলোড়িত করিয়া সামান্য মনুষ্যকৃত ভাষার শব্দে বিকলাঙ্গ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে তাঁহার হৃদয়কে প্রকৃতরূপে অনুভব করা কদাচিৎ সম্ভব।

অনেকে এমন মনে করেন যে, নানাবিধ ছন্দোবন্ধে এবং সুললিত শব্দে প্রকাশিত বাক্যই কাব্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এপ্রকার সহস্র কাব্যে এক বিন্দুও কবিত্ব না থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে ছন্দোবন্ধ বিরহিত একটীমাত্র পংক্তিতে আবার এত কবিত্ব থাকিতে পারে যে, সংসারে তাহার স্থান হওয়া কঠিন। এতদ্ভিন্ন সেক্সপিয়রে বা কালিদাসে যে কবিত্ব নাই, হয়ত কোন বাক্যশূন্যহৃদয়ে তাহা আছে! ছন্দঃ, বাক্য এবং চিন্তা কবিত্বকে পরিচালিত করিতে পারে না এবং তাহাদিগের দ্বারা কবিত্ব পরিপুষ্ট হয় না, বরং তাহারাই কবিত্বের দ্বারা পরিচালিত, অঙ্গ প্রাপ্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। কবিত্ব,—চিন্তা, বাক্য বা ছন্দের দাস নহে এবং কখনই তাহাদিগের অনুজ্ঞা-পালন করে না। যেখানে ছন্দঃ নাই, বাক্য নাই এবং চিন্তা নাই, কবিত্ব সেখানেও অনন্তভাবের ও প্রকৃতির সহিত আনন্দক্রীড়ায় রত থাকিতে পারে। তবে যদি কবি-হৃদয়ের সহিত চিন্তা, বাক্য এবং ছন্দের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে সে সংযোগ যে সুখের সংযোগ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অতুল লাবণ্যময়ী কামিনীর কান্তি অলঙ্কারে শোভিত না হইয়াও যে লাবণ্যচ্ছটা ছড়াইতে পারে তাহা গোলকুণ্ডার হীরকখচিত কুৎসিত রমণীতে সম্ভবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কাব্য কি? কবির ভাষায় প্রকাশিত কবির হৃদয়-ভাবের নামই কাব্য। কবির ভাষায় কবির হৃদয়ভাব যে সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইবে তাহা হইতে পারে তাহা নহে, তবে এমত ভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক যে, সেই ভাষা অন্যের হৃদয়ের নিদ্রিতভাবসকলকে জাগ্রত করিয়া কবির হৃদয়কে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করাইতে সমর্থ হয়। ছন্দঃ, অলঙ্কার, সুললিতশব্দ ইত্যাদির দ্বারাই অন্যের নিদ্রিতভাবসকল সহজে জাগ্রত হওয়া সম্ভব। ছন্দঃ-অলঙ্কার নহিলে যে অন্যের হৃদয়ে সুপ্ত বীণা একেবারে বাজে না, বা বাজিয়া উঠিতে পারে না, আমরা তাহা বলি না। যেখানে ভাব সকল তীব্র এবং তীব্রগতিতে অন্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে [illegible]

নহিলেও চলিতে পারে। যেমন, শব্দ করিয়া যাহার নিদ্রাভঙ্গ করা যায় না, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে হয়, তেমনি, ভাব তীব্র ও তড়িৎগতি হইলে ছন্দালঙ্কার ব্যতিরেকেও কবিহৃদয় অন্যের অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু এই তীব্র তড়িৎগতি ভাবসকল আবার ছন্দালঙ্কারাদিতে শোভিত ও অলঙ্কৃত হইলে যে সহজে অন্যহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের ভাবসকল যেরূপ তীব্র, উজ্জ্বল এবং সহজে অন্যহৃদয়ে প্রবেশক্ষম, তাহাতে ইহা ছন্দালঙ্কার বর্জ্জিত হইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সহজেই যে রূপবতী, অলঙ্কার তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা না হউক, নিষ্প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম লাবণ্যময়ী রমণীমূর্ত্তি, সুতরাং তাহার রত্নভূষণ নহিলে ক্ষতি নাই। এই জন্যই কাব্যখানি গদ্যকাব্য। যাহার লাবণ্য আছে, তাহাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া কবি যে, কোন অঙ্গই আচ্ছাদিত রাখেন নাই,—ইহা ভালই করিয়াছেন। চন্দ্রবাবু যে অতি সামান্য চেষ্টা করিলেই কাব্যখানিকে নানাবিধ ছন্দোবন্ধে ও অলঙ্কারে সাজাইতে পারিতেন না, আমাদিগের তাহা বিশ্বাস হয় না। তাঁহার সহজ ও সরলভাবের জন্য বাস্তবিকই বন্ধন নিষ্প্রয়োজন। বন্ধনমুক্ত হইয়া তিনি যেমন অল্পকথায় এবং অল্পায়াসে ভাবসকলকে প্রকাশিত করিতে পারিয়াছেন, বন্ধনযুক্ত হইলে তেমন পারিতেন না। তিনি যে কেবল ছন্দাদি বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে ও নিম্নে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা নহে, কবিতা অনেকস্থলে বাক্যের বন্ধনকেও ছিন্ন করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে কল্পনাসহচরী চিন্তাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যিনি একবার তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, কবির হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে তখনই সেই ভাবের স্রোত চলিয়াছে, কোন প্রকার বিঘ্ন মানে নাই, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নানাদিকে এককালে ধাবিত হইয়া বিদ্যুৎগতিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছে। কি ছন্দ, কি ভাষা, কি চিন্তা—কেহই সেই উচ্ছ্বাসের নিকট দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় নাই। যদি কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কেহ প্রতিহত করে, তাহা হইলে প্রবাহ অবাধে ছুটিতে পারে না, সুতরাং কবিত্ব প্রকৃত এবং সহজ না হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কোনদিকে দৃক্‌পাত ও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উচ্ছ্বাসের স্রোতে ও ভাবের তরঙ্গে যাঁহারা স্বর্গ মর্ত্ত্য প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত কবি। কেন না প্রকৃতি স্বয়ং স্বাধীন ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন। উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে প্রকৃত কবির লক্ষণ অনেক বিদ্যমান আছে, একে একে আমরা তাহার বিশ্লেষ করিতে চেষ্টা করিব।

সৃষ্টিসম্বন্ধে প্রকৃতি ও পুরুষ যে সম্বন্ধ একটী সম্পূর্ণমনুষ্যসম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষেরও সেই সম্বন্ধ,—একের অভাবে অন্যের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না, সমাজ সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য উভয়েই 'নারিকেলের মালা'র ন্যায় অর্দ্ধাঙ্গমাত্র—স্ত্রীপুরুষ দুই না হইলে এক অঙ্গ সম্পূর্ণ হয় না। উভয়ে মিলিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করে বলিয়া স্ত্রী পুরুষের সহধর্ম্মিণী। সংসারধর্ম্ম

পালন করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি। প্রেম ও ভক্তি নহিলে যেমন মুক্তিলাভ হয় না, তেমনই স্ত্রীর প্রগাঢ় ভক্তি এবং স্বামীর অগাধ প্রেম নাহলে সংসার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। মনুষ্যত্বকে বিশ্লেষ করিলে আমরা প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। আবার তাহাদের মিলনে যে সামগ্রী উৎপন্ন হয়, এক একটী পৃথক করিয়া পরীক্ষা করিলে সে সামগ্রীর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—উভয়ের মিলন ব্যতিরেকে সে সামগ্রী জন্মে না। যেখানে উভয়ের মণি-কাঞ্চনসংযোগ ঘটিয়াছে সেইখানেই পবিত্রতা বিরাজিত আছে, সেইখানেই মনুষ্য-সৃষ্টির সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে, অন্যথা স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের বিচ্ছিন্ন জীবন বিড়ম্বনামাত্র, সমাজ ভিত্তিশূন্য, ভক্তি প্রেমশূন্য, মনুষ্য মনুষ্যত্ব-শূন্য। উভয়ের সম্পূর্ণ সংযোগ ব্যতিরেকে পবিত্রতা প্রায় দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়, মনুষ্য মনুষ্যনামের কলঙ্ক হইয়া পড়ে, সমাজ বন্ধনশূন্য হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কেবল ভক্তিতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, কেবল ভক্তিতে ঈশ্বর নিকটবর্ত্তী হন না—ভক্তির সহিত প্রেম চাই। সংসারে স্ত্রীর সহিত পুরুষের মিলন চাই। দেবাদিদেব মহাদেব কেবল ভক্তিতে ঈশ্বর প্রাপ্ত হন নাই, যত দিন না প্রেমরূপিণী পার্ব্বতীর সহিত উদ্বাহ হইয়াছিল তত দিন তাঁহার তপঃসিদ্ধি হয় নাই। তাই বলি, প্রেমরূপিণী ভার্য্যা এবং ভক্তিরূপী স্বামী নহিলে মনুষ্যত্ব জন্মে না—ভক্তি একা কেবল কঠোরতামাত্র। স্ত্রী সমাজের ভিত্তি, পুরুষ সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করে বলিয়া মহৎ, নতুবা স্ত্রীবিহীন পুরুষ কিছুই নহে। যে সময়ে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়, সেই সময় হইতে স্ত্রীর ভক্তি ও পুরুষের প্রেম শিক্ষা আরম্ভ হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির সেইই প্রথম সোপান,—সেইখানেই বিশ্ব-ব্যাপী প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। এই জন্য হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া করিতে হয়। এই সংযোগ ছিন্ন হওয়াতেই উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম কাব্যের সৃষ্টি।

কাব্যের বিষয়ী প্রেম। প্রকৃত কবির ইহা একটী উপযুক্ত বিষয় বটে। প্রেম ব্যতিরেকে স্বর্গীয়ভাব পৃথিবীতে আর কে আনিতে পারে? চন্দ্রবাবুর হৃদয় যেমন গভীর, তাঁহার প্রেমও তেমনি গভীর। প্রেমের দিকেই সকল হৃদয় ধাবিত এবং প্রেমই সকল হৃদয়ের লক্ষ্য, কেন না, জীবনের লক্ষ্য যে ঈশ্বর, তিনিই প্রেমে বাঁধা। যে যত অধিক প্রেমময়, সে তত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী। খ্রীষ্ট সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের পুত্র। মনুষ্যের দুঃখনিবারণই চৈতন্যের উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি ভগবানের অংশ। জগতের দুঃখে দুঃখী বলিয়া শাক্যসিংহ—বুদ্ধদেব। শত্রুর দুঃখে দুঃখী বলিয়া রামচন্দ্র—বিষ্ণুর অবতার। তাঁহাদের প্রেমের অনন্ত রাজ্য বলিয়া তাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণে নহে। প্রেমের সীমা যতই গভীর ও বিস্তৃত হইবে, মনুষ্যের ততই দেবত্ব-লাভ হইবে। কেন না যেখানে প্রেম, সেই খানেই ঈশ্বর। প্রেম বিস্তৃত হইলে যে গভীরতা থাকে না, তাহা আমরা বুঝি না। যাহা অল্প এবং সীমাবদ্ধ তাহারই গভীরতার লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সমুদ্র অনন্তবিস্তৃত হইলেও তাহার গভীরতার হ্রাস নাই। যাহা বিস্তৃত হইল বলিয়া গভীর হইল না, তাহা অতি সামান্য। খ্রীষ্ট

চৈতন্য, শাক্যসিংহ প্রভৃতি মহাত্মদিগের হৃদয়ে সে অল্পপরিসর প্রেম ছিল না। তাঁহারা এক এক জন অনন্ত প্রেমের উৎস। তাঁহাদিগের গভীর প্রেমস্রোত অনন্ত-বিস্তৃত হইয়া প্রত্যেক লোকেরই দ্বারে গিয়া লাগিয়াছিল। প্রেমের গভীরতার সহিত বিস্তৃতি নহিলে তাহার আদরবৃদ্ধি হয় না। গভীর অথচ বিস্তৃত প্রেমই পূজ্য ও নমস্য। এ প্রকার প্রেমে স্বার্থের নাম-গন্ধ নাই, তাহার সকলই নিঃস্বার্থ পরহিতান্বেষী। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের প্রেমে গভীরতা আছে বটে, কিন্তু নিঃস্বার্থতা নাই, বিস্তৃতি নাই। চন্দ্রবাবুর হৃদয় প্রেমময় সত্য, কিন্তু তিনি প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত। যাহা প্রকৃত প্রেম, তাহাতে উন্মত্ততা থাকিলেও উদ্‌-ভ্রান্তি নাই, চিত্তবিকৃতি নাই, শোকতাপ নাই, জ্বালাযন্ত্রণা নাই, হা-হুতাশ নাই, দীর্ঘ-নিশ্বাস নাই। তাহা কেবল অনন্ত প্রেমের অপ্রতিহত অনন্তপ্রবাহ। যত দিন জীব, ততদিন সে প্রেম জীবন্ত। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের শীতবসন্ত নাই, চিরদিনই একটানা স্রোত। সে হৃদয় একের জন্য পাগল নহে, সমস্ত জগতের জন্যই তাহার প্রাণ, সমস্ত মনুষ্যই তাহার প্রণয়-পাত্র। এই জন্য সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিত কোম্‌ৎ মনুষ্যসমাজের অধিক ঈশ্বর মানেন না।

কিন্তু আমাদিগের কবির হৃদয় কেবল একহৃদয়ের জন্যই পাগল! সেই প্রণয়-পাত্রের অনুপস্থিতিতেই উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের সৃষ্টি। সমস্ত দুঃখসন্তাপ কেবল তাহারই জন্য। এ প্রকার প্রেমকে আমরা স্বার্থ-পূর্ণ বলিয়া যাহা পাইলে সুখী হই, তাহা হস্তবহির্ভূত হইল বলিয়া যে অসুখ, তাহাতে স্বার্থত্যাগ কোথায়? তাঁহার প্রণয় গভীর এবং পবিত্র বটে, কিন্তু যেখানে অধিক স্বার্থ সেখানে গভীরতার সীমা ও বিস্তৃত। আর যে প্রেম পবিত্র নহে তাহার কথা আমরা মুখে আনিতে চাহি না। যদি এ প্রেমে সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য কাতর হইত, যদি জগতের দুঃখে দুঃখ করিতে জানিত,—তাহাহইলে আমরা ইহার পূজা করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহা বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া ইহার গভীরতার আশানুরূপ আদর হয় নাই। যদি ইহাতে স্বার্থের কথা না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থখানি প্রতিপ্রেমিকের হৃদয়ের ধন হইত। কিন্তু ইহাতে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতের কথা নাই। বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখরে যে প্রেমের কথা আছে সে মূলসত্য আছে, সে দেবভাবের উপদেশ আছে, ইহাতে তাহা নাই। তথাপি যে সমাজে স্ত্রী স্বামীর দাসীর অধিক নহে, ইহা যে সে সমাজের একটী অমূল্য সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিলের স্ত্রী জাতির বশ্যতা ("Subjection of Women") নামক গ্রন্থে যে উপদেশ আছে, ইহাতে তাহার অধিক আছে। স্ত্রীজাতি যে বাস্তবিক অশ্রদ্ধার সামগ্রী নহে এবং তাহারা যে পুরুষের প্রকৃত বন্ধু ও প্রাণের প্রাণ, ইহাতে এ প্রকার বিস্তর নীতিপূর্ণ শিক্ষা আছে। স্ত্রীপুরুষ সমানভাবে না মিলিলে যে সমাজ ভাল চলে না, তাহাও ইহাতে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

সন্ধ্যা।

১

সন্ধ্যা আসিতেছে, ডুবেছে তপন,
বহে মৃদু মৃদু বায়,
চাতকের দল করে কলরোল
আকাশের কালো গায়।

২

পশ্চিমের কালে রাঙা মেঘগুলি,
ধূসরে চাঁদিমা-রেখা,
সুদূর আকাশে সাঁজের তারাটি
ধীরি ধীরি যায় দেখা।

৩

আধেক আঁধারে, আধেক আলোতে,
দুলিছে বটের ডাল,
স্তব্ধ নীরবে দাঁড়ায়ে র'য়েছে
বিশাল তমাল শাল।

৪

সন্ধ্যে! তোর প্রাণে এত গভীরতা
আগে কে জানিত বল?
অপরূপ ওই উদাস নয়ন
ছায়িছে নবমতল।

৫

এলোথেলো কেশে যোগিনীর বেশে
পাগলিনী হাসে যেন;—
ওই ও হাসির মোহিনী দীপিকা
পাগল করেছে প্রাণ!

৬

কেন, বল দেখি, এতদিন পরে
আসিলে এ প্রাণে মোর?
কেন গো আবার, বল, জোর করে
ভাঙালে ঘুমের ঘোর?

৭

একিরে আজিকে দেখি'ছি স্বপন?
জগৎ কি স্বপ্নময়?
প্রাণের মিলন তাও কি স্বপন?
স্বপন বই সে কিছুই নয়।

৮

প্রণয়-কুসুম ফোটে কি স্বপনে?—
স্বপ্নেই কি অবসান?—
তা' যদি সকলি— কেবলি স্বপন—
স্বপ্নেই মিশুক প্রাণ!

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সার সংগ্রহ।

মাসিক পত্র।

/আর্য্যদর্শন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১; ১০ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

[আর্য্যদর্শন দশম বৎসরে পদার্পণ করিলেন। সম্পাদক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, এখন হইতে এই পত্র প্রতিমাসের ১৫ই তারিখে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইবে। এতদুপলক্ষে মিরার বলিয়াছেন যে, "আজকাল প্রতিজ্ঞার বাজার বড়ই সস্তা হইয়া পড়িয়াছে। 'ভঙ্গ' করিবার জন্যই যেন প্রতিজ্ঞা করা হয়"। আমরা ভরসা করি, আর্য্যদর্শনের প্রতিজ্ঞা এবার ভঙ্গ হইবে না।]

১ম ও ২য় সংখ্যার বিষয়ঃ—

১। হতাশাপীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি। (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

২। হিন্দু-সমাজ সংস্কার।

৩। আর্য্যবীর। (শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৪। সংসার—পদ্য। (শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

৫। অষ্ট্রেলিয়া। (শ্রীহিতেন্দ্র—)।

৬। সাধনা। (শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৭। উন্নতি-রহস্য। (শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৮। [illegible]।

৯। আমার জীবনের ইতিহাস।—(শ্যাম—)।

১০। শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ। (শ্রীবঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।)

১১। কণ্বমুনি ও প্রস্পেরো।

১২। প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২। হিন্দুসমাজ সংস্কার—প্রথম প্রস্তাব। হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয়। পরাধীনতাই ইহার কারণ। "পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব নাই। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন—অরণ্যে রোদনমাত্র। তাহার জন্য সমস্ত জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করা উচিত নহে।" কুকুর কেবল অনুগ্রহভিখারী বলিয়া যেমন ঘৃণ্য, আমরাও নিরন্তর পরমুখাপেক্ষী হইলে তাহার সমান হইব। শ্বেত-পুরুষেরা যে আপন স্বার্থহানি করিয়া আমাদিগের উন্নতিসাধন করিবেন এমন পাত্র তাঁহারা নহেন। তবে কি প্রকারে আমরা আবার উন্নত হইতে ও রাজনৈতিক আসনে স্বাধীনভাবে বসিতে পাইব? লেখক বলেন—"সামাজিক উন্নতি হইলে রাজনৈতিক উন্নতি আপনিই আসিবে।" * * * ভারতের অধঃপতনের মূল সামাজিক বৈষম্য ও স্ত্রীজাতির

অবনতি।" কি উপায়ে সামাজিক বৈষম্য অপনীত হইতে পারে ও স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্ভবে, এক্ষণে তাহারই আন্দোলনে জাতীয় শক্তি ব্যয়িত হওয়া উচিত; কিন্তু হিন্দু-সমাজ এই আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে উদাসীন। আর উদাসীন থাকা উচিত নহে—একটী একটী করিয়া সংস্কার আরম্ভ করিলেও কতদিনে সমস্ত সমাজ সংগঠিত হইবে তাহা বলা যায় না। লেখক ক্রমে ক্রমে জাতীয় অবনতির সকল মূলীভূত কারণেরই উল্লেখ করিবেন। প্রথম প্রস্তাবে বিধবাবিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারমতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে যাঁহারা বিধববিবাহ করিতেছেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। লেখক বলেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায় এবং সমাজের পক্ষে অপকারী। যাহাতে এ প্রকার না হয়, তজ্জন্য "এক্ষণে যাঁহারা বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন—আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সমিতি সংগঠিত করিতে চাহি। এই সমিতিকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিধবাবিবাহ-প্রচারের জন্য স্বতঃপরতঃ অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতে চান—তাঁহাদিগের মন ফিরাইবার চেষ্টা করা সমিতির লক্ষ্য হইবে না। সমিতি কেবল বিবাহার্থিনী বিধবাগণের বিবাহ দিয়া দিবেন। এবং যাঁহারা বিধবাবিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন। যাঁহারা এই সমিতির সভ্য হইতে চান, তাঁহারা আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া আর্য্যদর্শন-সম্পাদকের নিকট ময়মনসিংহে পত্র লিখিবেন। সভ্যসংখ্যা অধিক হইলে সভার নিয়মাবলী প্রচারিত হইবে। সভ্যসংখ্যা পূর্ণ হইলে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগরমহাশয়কে এই সভার সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। যিনি বিধবাবিবাহ-প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি জীবিত থাকিতে সভাপতির আসন আর কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। সহযোগী সম্পাদকমণ্ডলীকে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি। এবং তাঁহাদিগের মতামত জানিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি। * * * এই সমিতি যে শুদ্ধ বিধবাবিবাহ লইয়াই থাকিবেন, তাহা নহে। একে একে সমস্ত সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন। ইহার লক্ষ্য পরে বিবৃত করা যাইবে।"

৬। সাধনা। প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট করিবার প্রয়াস পাওয়াতে প্রবন্ধটী কিছু দীর্ঘ হইয়াছে। আমরা ইহার কেবল আভাসমাত্র দিলাম। যে যাহার সাধনা করে, তাহার পক্ষে সে বিষয়টী কঠিন বলিয়া বোধ হয় না এবং সাধিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু অন্যে তাহাতে অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা করিয়া থাকে। এই নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যেমন প্রযুজ্য জাতিবিশেষের পক্ষেও তেমনই। সাধনা ব্যতীত এক্ষণে ভারতলক্ষ্মীর উদ্ধার অসম্ভব। কিন্তু সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া অবনতির দিকেই তাহার গতি দেখা যাইতেছে। আত্মশক্তির চালনা রহিত হওয়াতে পরশক্তিই এক্ষণে নির্ভর হইয়াছে। পরের উপর নির্ভরে শ্রেয়ঃ কোথায়? যাহার উপর

নির্ভর করিতেছ, তোমার অপেক্ষা তাহার শক্তি কিসে অধিক? শক্তি সমান, তবে সে চালনা করে; তুমি চালনা না করিয়া জড়পিণ্ডবৎ। আত্মশক্তি চালনা করিলে ভারতসন্তান যে আবার উন্নত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? পরশক্তি সর্ব্বদাই অনর্থের মূল; আত্মনির্ভরই কেবল উত্থানের উপায়। "এই আত্মশক্তি চালনার জন্যই তুমি এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ। অপর যদি কেহ তোমার খরচে আত্মস্বার্থসাধন করে, দোষ আমি স্বার্থসাধককে দিই না, দোষ দিই তোমাকে যে, তুমি কেন তোমার নিজ স্বার্থে অনভিজ্ঞ, তুমিও কেন জমা না হইয়া খরচ হইতে যাও। সে তাহার আপন কার্য্য সাধিতেছে, তুমি তাহা পারিতেছ না, তাহার দোষ কিসে?" যদি এমন তর্ক কর যে, যখন সমস্ত প্রকৃতির ক্রমশঃ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, তখন আমারও উন্নতি হইবে, তবে কেন বৃথা শ্রম করি? তাহার উত্তর এই যে, প্রকৃতি উন্নতিশীল হইয়া তোমাকে পর্য্যন্ত আত্মসাৎ অর্থাৎ তোমার আত্মলোপ করিবে এবং তুমি যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকৃতির উপর দ্বিতীয় প্রকৃতি-রূপে সৃষ্ট হইয়াছ তাহার সফলতা কিছুই থাকিবে না। অতএব আত্মশক্তিচালনাদ্বারা তোমার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা উহার চালনা হওয়া আবশ্যক, কেন না উহা স্বয়ং অন্ধ। কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি? "ঈশ্বরের নিকট যে আপনার কর্ম্মকারকত্ব-বোধ এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে আমি কর্ম্ম করিতে বাধ্য—এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থ।" সুতরাং ধর্ম্মেই ভারতের জীবন, ধর্ম্মকে অবলম্বন ব্যতীত ভারতের উন্নতি সংসাধিত হইবে না। ধর্ম্ম বলিতে কেবল প্রার্থনা ও পরলোক ইত্যাদি বুঝিতে হইবে না—যে শক্তি লইয়া সংসারে আসিয়াছ, এই সংসারে বসিয়া তাহার পরিচালনা না করিলে কি প্রকারে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য হইল? পরলোক, পরের কথা—সেখানকার জন্য তুমি সৃষ্ট কি না, কে জানে? মূলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। আমাদিগের স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় একতা, নানা অনুষ্ঠান, নানা সংস্করণ কেবল বাক্যে পরিণত হইয়া যায়। মূলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি নাই বলিয়া কিছুই স্থায়ী হয় না। কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সূক্ষ্ম ও সুদক্ষ করিবার জন্য আত্মসংস্কার ও শিক্ষার প্রধানতঃ প্রয়োজন। আত্মসংস্কারের অর্থ, প্রাকৃতিক নিয়মে শরীর ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা। আত্মসংস্কার ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি পবিত্রভাবে চালিত হইতে পারে না। পবিত্রতার জন্য যেমন আত্মসংস্কারের প্রয়োজন, তেমনই কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশস্ততাসাধনজন্য শিক্ষার প্রয়োজন তদধিক। জাতিমধ্যে সর্ব্বসাধারণেরই শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক—মনে ও শরীরে। ভারতবাসীর মনে ও শরীরে বিস্তর বল আছে, কেবল আলোচনার অভাবে তাহা প্রকাশ পায় না—লেখক ইহার বিস্তর প্রমাণ দিয়াছেন।

বান্ধব। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১; ৮ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে:—

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্ম্ম।

২। অগ্নিকল।

৩। আমি কি নাস্তিক?

৪। প্রাচীন ভারত। (শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ)।

৫। নায়ক ও নায়িকা।

৬। হিন্দুদিগের অবনতি।

৭। সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

৬। হিন্দুদিগের অবনতি—জমীদার ও প্রজা। গ্রাম নগর প্রভৃতি যে যে স্থানে লোকে বাস করে সেই সেই স্থানের শাসনের ও কর আদায়ের জন্য গ্রামাধ্যক্ষ, দর্শী, বিংশী প্রভৃতি লোক নিয়োজিত থাকিত। এই লোক রাজদ্বারা নিয়োজিত হইত এবং বেতনস্বরূপ নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি পাইত। বংশপরম্পরায় এ প্রকার কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইত না, কেবল উপযুক্ততার উপরই নির্ভর করিত। ভূমির উপর ইহাদিগের কোন সত্ব ছিল না—কেবল রাজস্ব আদায়াদি করিত মাত্র। তাহারা করবৃদ্ধি ইত্যাদি কিছুই করিতে পারিত না। সুতরাং প্রজাগণই ভূস্বামী ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল প্রজাই ভূস্বামী থাকিতে পারে না—ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি পত্তন লইয়া চাষ করিত, এমন এক প্রকার প্রজাও ছিল। ব্রাহ্মণেরা নিজে কৃষিকার্য্য করিতেন না, অন্য লোককে ভূমি দিয়া তাহার শস্যের অংশমাত্র লইতেন। তাঁহাদিগের কর লাগিত না, কেবল রাজার ষষ্ঠাংশ ও গ্রামাধিপের ভাগ দিতে হইত। ভূমির উপর প্রজাদিগের যে প্রকার সত্ব ছিল কালে তাহার পরিবর্ত্তন হইল। রাজশাসন যত শিথিল হইতে লাগিল, গ্রামাধিপতিদিগের পদগুণের উপর নির্ভর না করিয়া বংশ সম্পত্তিতে পরিণত হইতে লাগিল এবং গ্রামাধিপতিগণ অবসর পাইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এদিকে ভূস্বামী প্রজার সংখ্যা ও বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে হ্রাস হইতে লাগিল। ভূস্বামীগণ নামতঃ ভূস্বামী রহিলেন কিন্তু প্রকৃত ভূমির সত্ব উক্ত গ্রামাধিপতিদিগের হস্তে আসিতে লাগিল। কালে ইঁহারাই জমীদার হইয়া দাঁড়াইলেন, প্রজাসকল তাঁহাদিগের বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে কর দিতে লাগিল। আকবর যখন সম্রাট হইয়া এ দিকে মনোযোগ করিলেন তখন এই নূতন ভূস্বামীগণ এত প্রবল হইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের সহিত হস্তাপণ করিতে গেলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহারা রাজার দ্বারা কেবল শান্তিরক্ষা ও কর আদায়ের জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাই ক্রমে ভূমির উপর আপন সত্ব সাব্যস্ত করিয়া জমীদার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যদি ইহাই প্রকৃত জমীদারের ইতিহাস হয়, তবে এ অন্যায় সত্ব রক্ষার্থিবার জন্য বেঙ্গল বিল উপলক্ষে জমীদারদিগের এত আড়ম্বর ও বাগ্‌বিতণ্ডা কেন?

প্রবাহ। জ্যৈষ্ঠ,১২৯১; ৩য় ভাগ, ২য় সংখ্যা।

১। ভারতীয় রাজকুল-দর্পণ। (শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়)।

২। ন্যায়-দর্শন। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি)।

৩। শৈশব-শাসন ও ব্যায়ামশিক্ষা।—(শ্রীযুক্ত সাঙ্গন ধর্ম্মদাস বসু, এল, আর, সি, পি; এল, আর, সি, এস,)।

৪। চন্দ্রগ্রহণ—পদ্য। (শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার)।

৫। শিক্ষা। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

৬। আমি—সপ্তম পত্র।

৭। কবিবর জয়দেব গোস্বামী—পদ্য। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

৮। দেবদূত—সমালোচন।

১। ভারতীয় রাজকুল দর্পণ—নবম অধ্যায়ে আলবর, দশম অধ্যায়ে বিকানীর, একাদশ অধ্যায়ে যশলমীর, এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে শিরোহীর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিবরণগুলিতে দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইতেছে। বিবরণ আর একটু বিস্তৃত হইলে ইতিহাসপাঠকদিগের সুখপাঠ্য হইতে পারে। এক্ষণে কেবল আভাসমাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

৩। শৈশব-শাসন ও ব্যায়াম শিক্ষা। প্রয়োজনমত বালকবালিকাগণকে দণ্ড না দেওয়া অনিষ্টকর, তবে অযথোচিত দণ্ড দিয়া মনকে বিচ্ছিন্ন করায় অমঙ্গলকর ফল ফলে। বিদ্যালয়ে শারীরিক দণ্ড বিহিত নহে এবং মস্তকে প্রহার পীড়া উৎপাদক। সন্তানগণকে সুস্থ রাখিবার জন্য আমোদজনক ক্রীড়াকৌতুক করিতে দেওয়া আবশ্যক। যে সকল ক্রীড়ায় মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, মানসিক পরিশ্রমের পর তাহা করিতে দেওয়া বিধেয় নহে—তাস, পাশা ইত্যাদি এই শ্রেণীর ক্রীড়া। দৌড়ান, লম্ফপ্রদান করা, দাঁড় টানা, বেগে চলা, অশ্বারোহণ করা, সন্তরণ করা প্রভৃতি কার্য্য—যাহাতে অঙ্গচালনা হয়, তাহা আবশ্যক। অঙ্গচালনাদ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং পেশীসকল পুষ্ট হইয়া বালকবালিকাকে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম করে। ব্যায়াম শিক্ষা, আজকাল আমাদিগের দেশে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবেই অনেকে যৌবনে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন। বিদ্যালয়ে ও বাটীতে ইহার আলোচনা করা প্রত্যেক বালকবালিকারই কর্ত্তব্য তাহাদিগের অভিভাবকদিগের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

৫। শিক্ষা। মনুষ্যের আদিবৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই, কিন্তু মনুষ্য যে, সৃষ্টিকাল হইতে ক্রমান্বয়ে বহু সহস্রগুণে সমুন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। শিক্ষাই এই উন্নতির উপায়। প্রথমে, সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থই মনুষ্যের শিক্ষার বিষয় ছিল। যে আপনার অভাব বুঝিয়া প্রকৃতির নিকট শিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রকৃতি তাহাকেই শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষারও আবার অবস্থাভেদ আছে। অবস্থা অনুসারেই শিক্ষার বিষয় ও পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনুষ্য যখন যে অবস্থাপন্ন, তাহার শিক্ষার বিষয় ও সেই অবস্থার উপযুক্ত হইয়া থাকে। অতঃপর লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবনত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে শিক্ষার সমাদর ছিল, সুতরাং উন্নতিও হইয়াছিল এক্ষণে শিক্ষার আদর নাই, সুতরাং অবনতি অনিবার্য্য হইয়াছে। যে প্রণালীতে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে আশানুরূপ ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই এবং আমরাও পরাধীন বলিয়া রাজার উপর শিক্ষার ভারটীও দিয়া বসিয়া আছি—স্ত্রী-

শিক্ষার ত কথা নাই। আমাদিগের যে কিছু শিক্ষা হইতেছে তাহা য়ুরোপীয়দিগের প্রসাদে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যাহা শিক্ষা দিবেন অথবা তাঁহাদিগকে যাহা করিতে দেখিব তাহাই আমাদিগের উপযোগী নহে; যথা—পরিচ্ছদ, আহার্য্য ইত্যাদি। আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে মঙ্গল নাই এবং কেবল পুস্তকশিক্ষা ছাড়িয়া কার্য্যকরী শিক্ষা অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। এজন্য আমাদিগের স্বনিজচেষ্টার প্রয়োজন এবং যেখানে এবম্প্রকার শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে, তথায় গমনেও কাহারও বাধা দেওয়া উচিত নহে। যাঁহারা য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া এবম্প্রকার শিক্ষা লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে সমাজে লওয়া কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদিগেরও কর্ত্তব্য যে, স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়দিগকে সেই সকল শিক্ষা প্রদান করেন।—এ বিষয়ে যত আন্দোলন হয় ততই দেশের মঙ্গল, কিন্তু আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেও আরম্ভ করা আবশ্যক। ডাক্তার সরকারমহোদয়ের যে বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইলে আমাদিগের বিবেচনায় দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১; ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

১। সৃষ্টি কৌশলে স্রষ্টার পরিচয়। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)।

২। নরবলি। (শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ)।

৩। সমাজ-সমন্বয়। (শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়)।

৪। সংস্কৃত শিক্ষা। (পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ)।

৫। মানব ও মানবের ক্রিয়া। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত)।

৬। শাক্য চরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

৭। নবলীলা—উপন্যাস।

৮। "মলয় শিশু" ও "নলিনী" পদ্য (শ্রীবিঃ)।

১। সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়।—ধর্ম্মের ভিত্তিমূলস্বরূপ ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি সত্যে এক্ষণে অনেকের সংশয় উপস্থিত হইতেছে। ইয়ুরোপে কোন কোন প্রসিদ্ধনামা ব্যক্তি গ্রন্থাদিতে সংশয় প্রকাশ করাতে, ইউরোপীয় শিক্ষার সহিত এদেশেও তাহার সংক্রামকতা প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এই পরমাশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড যে চিৎ-শক্তিবিবর্জ্জিত অন্ধ জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই শক্তিপ্রভাবেই চলিতেছে, তাহা কি সত্য? অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তিও বলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু বাস্তবিক কি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব? লেখক এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সৃষ্টিকার্য্যে যে প্রকার কৌশল দেখা যায়, তাহা অন্ধ জড়শক্তির অতীত, এবং চিৎ-শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর আছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে, সংসারে যাহা দেখিবে তাহারই মধ্যে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভবিষ্যতের মঙ্গলজনক জ্ঞান, অন্ধ জড়শক্তিতে থাকা অসম্ভব এবং জড়শক্তির অভিপ্রায়জ্ঞান থাকিতে পারে না। সৃষ্টিকার্য্যে যখন সর্ব্বত্রই একটী না একটী অভিপ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অবশ্যই সৃষ্টি, স্থিতি ও

লয় কোন জ্ঞানময়ী শক্তির কার্য্য। ডিম্ব হইতে পক্ষী, জরায়ু হইতে মনুষ্য, ফলের অষ্টি হইতে পুনরায় ফল ইত্যাদি সহজ সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রবন্ধটী পরিস্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে। সৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ঈশ্বরে আমরা যে সকল গুণের আরোপ করিয়া থাকি তাহা যে ঐ জ্ঞানে অবশ্য থাকিবে তাহার প্রমাণ হইল কৈ? নগেন্দ্রবাবু সে পক্ষে একটু যত্ন করিলে বোধ হয় প্রবন্ধটী আরও উপকারে আসিত।

৩। সমাজ-সমন্বয়। লেখকের বিবেচনায় স্ত্রীপুরুষে সৃষ্টিগত কোন বিভিন্নতা নাই। মানসিক বলে স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা হীন নহে এবং শারীরিক বলও প্রয়োজনানুসারে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ সমান ছিল, কেবল কতকগুলি সামান্য কার্য্যের ভারার্পিত হওয়াতে স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান হীনাবস্থা সম্ভাবিত হইয়াছে এবং সমাজের প্রথম সময় হইতে পুরুষের অধীনে থাকিয়া তাহারা সকল বিষয়ে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষে যে কিছু সৃষ্টিগত দৈহিক পার্থক্য আছে, তাহা প্রয়োজনানুসারে হইয়াছে এবং সন্তানোৎপাদন করে বলিয়া স্ত্রীজাতিকে যে দুর্ব্বল হইতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। স্ত্রীপুরুষে সৃষ্টিগত কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, অতএব স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ন্যায় সকল বিষয়ে সমান সত্ব দেওয়া আবশ্যক। স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান সত্ব দিলে বাস্তবিকই সমাজের মঙ্গল হয় এবং যে কার্য্য এক্ষণে কেবল এক জনকে করিতে হয় উভয়ে সমানভাবে সে কার্য্য করিলে যে, কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়। বহুকাল অধীন থাকিয়া স্ত্রীজাতি অত্যন্ত অবনত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের পুনরুন্নতি অসম্ভব নহে। লেখক অল্পে অল্পে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সাহায্যে উন্নত করার প্রস্তাব করিয়াছেন।

মাস সমালোচন।

১। ব্যাণ্ডফোর্ড সাহেব পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, এ বৎসর হিমালয় হইতে অযথা পরিমাণে তুষারপতন হইতেছে, সেই জন্য বৃষ্টি কম হইবে; বোধ হইতেছে, যেন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। বাঙ্গালা, বেহার, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই—সকল স্থান হইতেই বৃষ্টির অভাব শুনা যাইতেছে; কোথাও কিছু কিছু হইয়াছে, কোথাও একেবারে হয় নাই, এবং সমগ্র দেশের কথা ধরিলে অতিশয় কম হইয়াছে

ইহাই বলিতে হয়। গত বৎসর সুন্দরবরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ষোলআনা শস্য জন্মে নাই। এ বৎসরেও যদি অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্যোৎপাদন না হয় তাহা হইলে দেশমধ্যে যে পূর্ণমাত্রায় দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে খ্যাতি ছিল যে, ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসবিনী, ধনধান্যে সুখৈশ্বর্য্যে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ, কিন্তু সভ্যতম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে ভারতবর্ষের আর সে অবস্থা নাই। এখন ভারতবর্ষের লোকেরা এরূপ গরিব হইয়াছে—এরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে, একবৎসর অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টির ফলে শস্যহানি হইলেই তাহারা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইয়া পড়ে, এবং সহস্রে সহস্রে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এরূপ সময়ে লোকে স্বভাবতই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রত্যাশা করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট পিতৃতুল্য, প্রজাবর্গ সন্ততিসদৃশ, সুতরাং অসময়ে প্রজাবর্গকে আহারপ্রদান করিয়া জীবিত রাখা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভারতবর্ষ যেরূপ বৃহৎ দেশ এবং ইহার অধিবাসী যেরূপ অসংখ্য তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি, পৃথিবীস্থ সমুদয় গবর্ণমেণ্ট একত্রিত হইলেও উক্ত কার্য্য সম্যকরূপে সংসাধিত হওয়া কদাচিৎ সম্ভব। সুধু অন্নদানে এবং মুষ্টিভিক্ষায় ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ অপনীত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে অন্য প্রকার সাহায্য চাহি এবং তৎসঙ্গে দেশের অধিবাসিদিগেরও যত্ন এবং চেষ্টা চাহি। ভারতবর্ষের অর্থ সম্পূর্ণ "জবর দস্তির" সহিত যে শতসহস্র প্রকারে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতেছে, এক পক্ষে গবর্ণমেণ্ট উদার রাজনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করুন, এবং অপর পক্ষে দেশের লোকেরাও চিরাভ্যস্ত আলস্য, উদাসীনতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা পরিত্যাগ করিয়া সমধিক উৎসাহ এবং যত্নের সহিত অর্থ-উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হউন—তবেই তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখ ও সাময়িক দুর্ভিক্ষজনিত যন্ত্রণা ঘুচিবে, নচেৎ অন্নকষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

২। গতমাসে কয়েকটী অতি বিষাদময় ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। প্রথমতঃ শ্রদ্ধেয় মহাত্মা শ্যামাচরণ বিশ্বাসের মৃত্যু, এবং দ্বিতীয়তঃ মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং শ্রদ্ধাস্পদ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উৎকট পীড়া। শ্যামাচরণবাবু ভারতবর্ষের গৌরবস্থান—বঙ্গীয় মসীজীবী কেরাণী সম্প্রদায়ের শিরোভূষণ ছিলেন। আর কৃষ্ণদাস? সুবিজ্ঞ, সদ্বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস? তিনি আজকাল ভারতের এই দুর্দিনে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন। এমন দিনে আমরা কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে কোনরূপেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ভারতের প্রতি বিধাতার কি কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে জানি না। কোথায় কৃষ্ণদাসের পীড়া কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে যাইতে ছিলাম, না অকস্মাৎ শুনি, কৃষ্ণদাস আর ইহজগতে নাই!! ভারতীয় রাজনৈতিকগগণের উজ্জ্বলতমনক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে!!! সেই দিন (১০ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার) দিবা দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে, বিনা মেঘে ভারতবক্ষে যে নির্ঘাত বজ্রাঘাত হইয়াছে,—বিধাতঃ!—সে নিদারুণ ব্যথা, সে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা কি আর কখন উপশান্ত হইবে?

৩। কলিকাতা মিযুনিসিপ্যালিটী লইয়া গত মাস হইতে একটা খুব আন্দোলন উঠিযাছে। আজকাল সমগ্রদেশমধ্যে কলিকাতা মিযুনিসিপ্যালিটীতেই যাহা কিছু আত্মশাসন আছে। অনেক দেশীয় বিদ্বান এবং সম্ভ্রান্ত লোক তথায় মেম্বরস্বরূপ নিযুক্ত আছেন,—তাঁহাবা উদ্যোগী, উৎসাহী, কার্য্যতৎপব এবং স্পষ্টবক্তা। এইরূপ অনেকগুলি লোক উপস্থিত থাকায় ইদানীং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিব যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং আমাদেব সমাজেবও অনেকগুলি সম্ভ্রান্তলোক সাধাবণকার্য্যে আপনাদিগেব বিদ্যা, বুদ্ধি এবং উদ্যম প্রয়োগ কবিবাব সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছে এবং আমবা এ সকল বিষযে যত একটু একটু অগ্রসর হইতেছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ ততই আমবা গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগেব চক্ষুঃশূল হইয়া পডিতেছি। কলিকাতা মিযুনিসিপ্যালিটিসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিযাছে। তবে ইহাতে বিশেষ দুঃখেব বিষয় এই যে, অপরাপর কর্ম্মচারিদিগেব সঙ্গে বাঙ্গালার মহামান্য স্বযং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুবও কুমন্ত্রণা পাইযা ইহাব বিরোধী হইযা দাঁডাইয়াছেন। ইলবার্ট বিলেব আন্দোলনেব সময় ছোটলাট বাহাদুর বিপক্ষ ইংরাজদিগের সেনাপতিত্ব কবিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি নিজমূর্ত্তি ধবিয়াছেন। এখনও সেই ভাবে চলিতেছেন। ইলবার্ট বিলের অপঘাত মৃত্যু ঘটাইয়া তিনি এক মহৎকীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে দেখা যাউক কলিকাতা মিযুনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহার কি প্রকার কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়।

আইনমত মিযুনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক বজেট ছোট লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইযা থাকে। তাহাব ঔচিত্যানুচিত্য বিষয়ে দেখিবায এবং তাহাতে যথাযথ হুকুম দিবার ক্ষমতা তাঁহাব সম্পূর্ণরূপে আছে, এবং ববাববই তিনি রীতিমত এই ক্ষমতা চালাইয়া আসিযাছেন। এমন অবস্থায মিযুনিসিপ্যালিটিব কার্য্যকলাপে যদি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ অনেক পবিমাণে তাঁহাব উপরেও আরোপ্য। এত কাল চলিযা গেল, সহরেব সাধাবণ স্বাস্থ্যের উন্নতিব জন্য মিযুনিসিপ্যালিটি প্রতি বৎসবই কিছু না কিছু কবিয়া আসিতেছেন, এবং তাহাব ফলে সহবের যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু সে সমস্ত কথা উড়িয়া গেল। এখন হঠাৎ ছোটলাটবাহাদুর বলিতেছেন যে, মিযুনিসিপ্যালিটি এবিষযে কিছুই যথেষ্টরূপে করেন নাই; এবং শুধু কিছু কবেন নাই, তাহা নহে; এবিষযে গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত হুকুমের ব্যবস্থার অবমাননা করিয়াছেন। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে এতকাল কি ছোটলাটবাহাদুরের কোন ক্ষমতাই ছিল না,—যদ্দ্বাবা তিনি মিযুনিসিপ্যালিটীকে আপনার হুকুম মানাইয়া লইতে পাবিতেন? অবশ্যই ছিল; কিন্তু তিনি তাহা চালান নাই। কেননা, সে ক্ষমতা চালাইবাব কোন আবশ্যকতাই হয় নাই। হুকুমেব অবমাননা হইয়াছে বলিয়া এখন মিযুনিসিপ্যালিটির উপর যে অভিযোগ আসিতেছে, আদৌ সে কথাটা কথাই নহে। আসল কথা এই যে, আজকাল রাজকর্ম্মচাবিদিগের ইচ্ছা হইযাছে যে, "যেন তেন প্রকারেণ" কলিকাতা মিযুনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান গঠন

ও কার্য্যপ্রণালী উলটাইতে হইবে এবং ইহার মেম্বরেরা যে এত স্বাধীনভাবে লম্বা লম্বা বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন, প্রত্যেক বিষয়ে আপনাদিগের স্বার্থ বুঝিয়া লইতে ও অনেক সময়ে আপনাদিগের ক্ষমতা চালাইতে চাহিতেছেন,—এই ভয়ানক 'শোচনীয়' 'অসহনীয়' অনর্থগুলি দূরীভূত করিতে হইবে! সাহেবেরা যেমন প্রকারান্তরে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, অমনি ছোটলাট-বাহাদুরও চটিয়া উঠিলেন এবং পূর্ব্বাপর সকল কথা ভুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির উপর অবাধ্যতা-দোষারোপ করিলেন। আজকাল বাঙ্গালাদেশে কতকটা সাধারণমতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিরোধী হইয়া ছোটলাটবাহাদুর এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারেন, দেখা যাউক।

৪। ভারতবর্ষের অপর একস্থানে আর একটি বিষয় লইয়া ভয়ানক আন্দোলন উঠিয়াছে। সে আন্দোলনের বিষয়—ইন্দোরের মহারাজা হলকার। অনেক দিন হইতে কয়েকটি কথা লইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ হলকারের কিছু মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে বিগত সিপাহীবিদ্রোহের প্রারম্ভে হলকার অন্ততঃ ২।৪ দিনের জন্যও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া যে রটনা আছে, সেই কথাই প্রধান। কর্ণেল ডুরাণ্ড যে সময়ে ইন্দোরের এজেণ্ট এবং হলকার যখন যুবা পুরুষ—কেবলমাত্র গদীতে উপবিষ্ট হইয়াছেন,—সিপাহী-বিদ্রোহ তখন উপস্থিত হয়। কিন্তু তখন ইংরাজদিগের সৈন্যেরাই প্রথমে বিদ্রোহী হয়, পরে মহারাজার নিজসৈন্যেরা তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দেয়। ডুরাণ্ড সাহেব বিদ্রোহের উপক্রম দেখিয়াই, সদলবলে তথা হইতে প্রস্থান করেন। তিনি যদি এরূপ অবস্থা তাড়াতাড়ি প্রস্থান না করিয়া মহারাজার সঙ্গে মিলিত হইয়া বিদ্রোহশান্তির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিতে পাইত না এবং অত্যল্পসময়ের ম'ধ্যই সমস্ত শান্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সেই ভয়ানক সময়ে তাঁহার বিপরীতবুদ্ধি উপস্থিত হইল, তিনি উভরায়ে পলায়ন করিলেন। সেই জন্য পূর্ব্বে একটু সামান্য গোলযোগ যাহা হইয়াছিল, তাহা একবারে ভয়ানক ব্যাপারে পরিণত হইল; দেখিতে দেখিতে ইন্দোর সহর এবং তন্নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশ বিদ্রোহানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মহারাজা হলকার সে সময়ে যথেষ্ট সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং অসাধারণ উদ্যম ও তৎপরতার সহিত অনতিকালমধ্যেই আপন সৈন্যদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য সমগ্র মধ্যভারতবর্ষ বাঁচিয়া যায় এবং বিদ্রোহী সরকারীসৈন্যেরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া তথা হইতে দিল্লী-অভিমুখে পলায়ন করে। ইহাই প্রকৃত—সত্য ঘটনা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডুরাণ্ড সাহেব পলাইয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিলেন যে, মহারাজ হলকার বিদ্রোহিদলের সঙ্গে মিলিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন; ৩।৪ দিন ধরিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছিলেন; পরে যখন বুঝিলেন যে, অবশেষে ইংরাজেরই জয় হইবে, তখন অগত্যা বিদ্রোহশান্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। বিদ্রোহশান্তির পর

ব্রিটিশ রাজত্ব পুনঃসংস্থাপিত হইলে এই কথা লইয়া মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরাজেরা সকলেই হুলকারকে দোষী বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু কেহ কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। আসল কথা এই যে, হুলকারকে নির্দ্দোষী বলিতে গেলে ডুবাণ্ড সাহেবকে দোষী বলিতে হয়। কিন্তু একজন মহামান্য সম্ভ্রান্ত মুকুট এবং তিলকধারী ভারতবর্ষীয় মহারাজা খেতাঙ্গ কর্ণেল ডুবাণ্ডের কাছে কোন্ ছার পদার্থ? মহারাজা উচ্ছিন্ন যাউন, সবংশে ধ্বংশ হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই,—কিন্তু কর্ণেল সাহেবের সুনাম অক্ষত রাখিতে হইবে। পরন্তু বিদ্রোহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মহারাজা হুলকার এই কথাটি ছাড়েন নাই, ইতিমধ্যে যত লাট সাহেব আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটেই তিনি এই কথার একটা শেষ নিষ্পত্তি করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্রোহের পর গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, হুলকার চুপ করিয়া থাকুন, যে দোষ তিনি করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজগুণে মার্জ্জনা করিলেন! মহারাজের আপত্তি এই যে, "ভালরে ভাল, আমি যখন কোন দোষই করি নাই, বরঞ্চ মহৎ উপকার করিয়াছি, তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে কোন্ বিষয়ের জন্য ক্ষমা করিলেন? যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা প্রমাণিত হউক; তজ্জন্য যে উপযুক্ত শাস্তি হইবে আমি লইতে প্রস্তুত আছি, নচেৎ কেন বৃথা মিথ্যা করিয়া আমার উপর একটা দোষারোপ করিয়া রাখিবেন"? কিন্তু ইংরাজেরা পরের "গরজের" কথায় কর্ণপাত করেন না, এবং যদিও হুলকার এতকাল উপর্য্যুপরি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি লর্ড্ রিপন বাহাদুরের নিকট হুলকার আবার এই কথা উপস্থাপিত করিয়াছেন। লর্ড্ রিপনের একটু ধর্ম্মজ্ঞান আছে, এবং শেষ রক্ষা করিতে পারুন না পারুন, সকল বিষয়ে সুবিচার করিব বলিয়া চেষ্টাটা করিয়া থাকেন। হুলকারের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, এবিষয় তিনি নূতন করিয়া বিচার করিবেন। কিন্তু লর্ড রিপনের এই সামান্য প্রতিশ্রুতির জন্য ইংরাজমহলে ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজেরা "বাটকবুল" যে, হুলকারের কথায় নূতন বিচার হইবে না। পাইওনিয়ার মুখপাত্র হইয়াছেন,—নূতন বিচার হওয়া যে অসম্ভব এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ তাহা সাব্যস্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এবং অবশেষ হুলকারের পক্ষ দুর্ব্বল করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার শাসনসম্বন্ধেও নানাপ্রকার অপবাদ রটনা করিতেছেন। ধন্য ইংরাজী সভ্যতা, ইংরাজী ন্যায়পরতা এবং ইংরাজী হৃদয়মহত্ত্ব! এতকাল সকলে চুপ করিয়াছিলেন, হুলকারের কোন দোষই কেহ শুনিতে পাইত না, কিন্তু যেমন তিনি আপন সত্ত্ব সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি জগৎসমক্ষে তিনি অপদার্থ অযোগ্য উৎপীড়নকারী রাজা বলিয়া বিঘোষিত হইতেছেন! সুধু তাহাই নহে, তাঁহার পুত্র বালবুদ্ধিতে কোথায় কি অনর্থ আচরণ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার মস্তকে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে!

৫। কলিকাতার উজ্জ্বলগগণে গত মাসে

হঠাৎ একটী উজ্জ্বল তারকার উদয় হইয়াছে। সে তারকা—পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি। পণ্ডিতবর প্রকৃতই তারকার গুণসমন্বিত কিম্বা খদ্যোতিকামাত্র তাহা এপর্য্যন্ত সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় নাই। তবে যেরূপ "জোর সোরের" সহিত কলিকাতা হেন স্থানে তিনি আপনার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন,—যে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকেরা, ঈশ্বর এবং দেব-দেবী মস্তকে থাকুন, এই জড়ময় প্রকাণ্ড জগৎব্রহ্মাণ্ডটাকেও অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগকেও তিনি শতসহস্র যেরূপ আপন বক্তৃতাস্থলে আকর্ষিত করিতেছেন,—তাহাতে তাঁহার সাহস এবং ক্ষমতাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না। হিন্দুধর্ম্ম—বর্ত্তমানের দেবদেবীপূজাসমন্বিত হিন্দু-ধর্ম্ম—যে, যুক্তিবহির্ভূত নহে এবং শিক্ষিত ভারতবাসিদিগের অগ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে,—ইহার সকল কথার, সকল বন্দো-বস্তের, সকল প্রথার যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে,——ইহাই (বোধহয়) সর্ব্বসাধারণকে বুঝান তর্কচূড়ামণিমহাশয়ের উদ্দেশ্য। দেখা যাউক, তিনি কি প্রকারে অগ্রসর হয়েন।

৬। রাজপুরুষদিগের শৈলপ্রস্থানের অব্যবহিত পর হইতেই দেশের রাজনৈতিক গগণ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল। কিন্তু গত-মাস হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ জোরের সহিত আবার নানাপ্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বক্তারা বক্তৃতা করি-তেছেন, লেখকেরা লিখিতেছেন, সাধারণ লোকেরা "গোলে হরিবোল" দিতেছে! দেশের লোক পয়সা দিয়া, শতসহস্র কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করুক, শাসনকার্য্যে ব্যতিক্রম এবং বিশৃঙ্খলা ঘটুক—তাহাতে ক্ষতি নাই, রাজপুরুষেরা শীতের সময় উষ্ণ কলিকাতায় এবং গ্রীষ্মের সময় শীতল সিমলায় অধি-বাস করিবেনই। বালা বাঙ্গালী, ধলা ইংরাজ, এবং "ফ্যাসবা" ফিরিঙ্গি—যে যেখানে আছে, সকলেই এই ভয়ানক অবি-চার বুঝিতে পারিয়াছে, এবং সকলে এক-মত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেছে। ধন্য কালায় একপ মিলন প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এ গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম অনেক দিন হয় নাই—এবারে দেখা যাইবে, ইহাতে কি ফল হয়। আমাদের মত এই যে, স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার সদস্যগণ কিছু দিনের জন্য শৈল-বিহার করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত অফিস ৬।৭ মাসের জন্য কলিকাতা হইতে একবারে অপসারিত হয়, ইহা কখনই উচিত নহে। ইহাতে একে টাকার শ্রাদ্ধ হয়, দ্বিতীয়তঃ শাসন কার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এসম্বন্ধে আন্দো-লনটা যেরূপ ভাবে উঠিয়াছে, তাহা কিছুদিন অপ্রতিহত থাকিলে, অবশ্যই অচিরে অতি সুফল প্রসব করিবে।

৭। মান্দ্রাজেসালেম হাঙ্গামাসম্ব-ন্ধীয় গোলযোগ এখনও শেষ হয় নাই। এই মোকদ্দমাতে একজন সম্ভ্রান্ত মিয়ুনি-সিপাল কমিশনরও অভিযুক্ত হয়েন। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন। এক্ষণে যে যে ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের উপর মিথ্যা-সাক্ষ্যের মোকদ্দমা চলিতেছে। তন্মধ্যে অনেকেই শাস্তি পাই-য়াছে, এবং অনেকের মোকদ্দমা এখন

বিচারাধীন। এই মোকদ্দমায় যে সমস্ত কথা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা শুনিয়া লোকে অবাক হইতেছে, এবং আসল মোকদ্দমা—যাহার জন্য সালেম নগরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্তলোক দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন—যে, সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং সাজান, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছে। লর্ড রিপন কি এখনও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না? মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিলে শাসননীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়—এই কথাই লর্ড রিপন সালেম-অধিবাসিদিগের আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোর অন্যায়, অবিচার, এবং অত্যাচার হইয়াছে ও হইতেছে দেখিয়াও কি এই নীতি-অনুসারে নিশ্চেষ্ট এবং উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? এ কি ভয়ানক কথা। এমন নীতিকে আমরা দুর্নীতি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, এবং এই দুর্নীতি যাহাতে অচিরাৎ দূরীভূত হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে ভারতবাসিমাত্রেরই চেষ্টা করা উচিত।

৮। দেশের কথা ছাড়িয়া এক্ষণে একটু বিদেশের কথা বলা যাউক। ইজিপ্টের সম্বাদ পূর্ব্ববৎ। কেবল বিশেষ এই যে, মাহাদির বিক্রম হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। ডাঙ্গালার মুদীর—যিনি এতদিন মৌচিকে ইংরাজের পক্ষেই ছিলেন, তিনি—প্রকাশ্যভাবে মহাদীর সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। খার্টুমের অবস্থা এক্ষণে বড় বিপন্ন, জেনারেল গর্ডন এক্ষণে চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত। ব্যাপারটা ক্রমশই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে, এবং ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ইংলণ্ডের মৈসবিক রাজনীতিরও কোন বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না, সমস্তই গোলযোগে পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ গ্ল্যাডষ্টোন অদ্বিতীয় লোক, অবশ্য ভিতরে ভিতরে কিছু করিতেছেন, কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে কখন কখন "সাত চোঙ্গার বুদ্ধিও এক চোঙ্গার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।' এ দিকে শুনিতেছি, ইজিপ্ট-গবর্ণমেণ্ট "ফেল" হইয়াছেন। এতদিন হন নাই, ইহাই আশ্চর্য্য, এক্ষণে হইয়াছেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। ইয়ুরোপীয়েরা যখন যে দেশে পদার্পণ করেন, তখন হস্তে এক মুষ্টি সর্ষপ এবং পকেটে করিয়া একটী "ঘুঘু" লইয়া যান। ইজিপ্টে যে তাঁহাদের এই অভ্রান্ত রীতির কোন ব্যতিক্রম কিম্বা ত্রুটী ঘটিবে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।

৯। রুষের কোন নূতন সম্বাদ নাই। রুষ এক্ষণে আমাদের গৃহপ্রাচীরে আসিয়া বসিয়াছেন এবং বসিয়া বসিয়া আমাদের গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা সন্দর্শন করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহার দর্শনে আমাদের গৃহে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। 'ভল্লুকের' আগমনের কথা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভল্লুক সুদূর-হিমালয়পারস্থিত; কিন্তু তথাপি যে আসিয়াছেন—নিকটে আসিয়া আমাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিতেছেন, সে কথা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানিতে পারিয়াছে। এই নূতন সম্বাদে ভারতবর্ষের মনের ভাব ক্রমশঃ কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের গৃহের কর্ত্তা ইংরাজসিংহ, বোধ করি, নিশ্চিন্ত নহেন;

ভিতরে ভিতরে কি করিতেছেন, বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকাশ্যে শুনিতেছি যে, ভল্লুক ও সিংহরাজত্বের পারস্পরিক সীমানির্দ্ধারিত হইবার চেষ্টা হইতেছে। এই জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হইবে এবং শীঘ্রই সে কমিশন যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথার ঠিক ঠিকানা করিবেন।

নানাকথা।

গত কয়েক সপ্তাহ হইতে কলিকাতায় ধর্ম্মান্দোলনের বড় ঘটা। থিয়েটার পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মান্দোলনের তরঙ্গবেগ গড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর আন্দোলনমাত্রেই সারবত্তা ও স্থায়ীভাব অতি অল্প, অতএব বলিতে কি,—উপস্থিত আন্দোলনের প্রতি আমাদিগের তাদৃশ আস্থা নাই। যাহাহউক আমরা ইহার বিরোধীও নই, এতদ্দ্বারা যদি দশজন লোকেরও 'মতিগতি' ফিরে—ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্মে তাহা হইলেও স্বদেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা সম্যকরূপে হিন্দুসাধারণসম্মত নহে এবং আমরাও তাঁহার 'ব্যাখ্যা'ঘটিত সকল কথার পক্ষপাতী নহি। শাস্ত্র কাহাকে বলে, কোন্ শাস্ত্রদ্বারা বর্ত্তমানকালের অনুষ্ঠানপর হিন্দুগণ সাধারণতঃ চালিত হন এবং কোন শাস্ত্র আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর উপযোগী—প্রথমতঃ ইহা নির্ণয় করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলে, বোধ হয়, ভাল হইত। কেন না, শাস্ত্রাভিধেয় আর্য্যগ্রন্থাবলীর সংখ্যা নাই। শাস্ত্রের 'দোহাই' দিয়া একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন (প্রতিদ্বন্দ্বী) মত অনায়াসেই চালান যাইতে পারে এবং এইরূপ চালান হয় বলিয়াই সচরাচর হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসা হইতে দেখা যায় না। পরন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা উহার সমন্বয় ও সমাঞ্জস্যসাধন,—এই দুইটীর প্রধানতঃ কোন্‌টী তর্কচূড়ামণিমহাশয়ের উদ্দেশ্য, ইহাও আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। যাহাহউক, তিনি যে একজন সুচতুর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাতে অবশ্য আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা বা ব্যাখ্যান শুনিয়া কলিকাতাসহর যে মাতিয়া উঠিয়াছে,—তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হই নাই। কলিকাতায় সর্ব্বোপরি 'হুজুকবাদের'ই প্রধান্য। হুজুকে বাঙ্গালী, হুজুকে মাতে, সে দিন 'পীরের জলপড়ায়' মাতিয়াছিল, আজ পণ্ডিতের ব্যাখ্যানে মাতিয়াছে। যাহা হউক, শেষোক্ত 'মাতুনি'

হইতে যদি কিঞ্চিন্মাত্র মঙ্গলও প্রসূত হয় তাহা হইলেও যথেষ্ট সুখের বিষয়।

যে আন্দোলনদ্বারা সমাজে উন্নতি ও একতা আনীত হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। উন্নতি ও একতাবিরহিত আন্দোলন অস্বাস্থ্যকর ও অশান্তিরই আধার। বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনে বঙ্গের কতটুকু ধর্ম্মোন্নতি হইবে তাহা এখনও অবশ্য ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে একতাবিহীন বিসম্বাদসঙ্কুল দেশে অধিকতর বিষাক্ত বিসম্বাদের বীজ রোপিত হইতেছে, ইহা বস্তুতই হৃদয়বিদারক। বিচার-ব্যাখ্যান বিতর্ক-বাদানুবাদ করিবে,—কিছুমাত্র আপত্তি নাই। বিদ্যাবত্তা, শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কলহ ও ব্যক্তিগত কুৎসার আবশ্যক কি? উহা না হইলে কি ধর্ম্মের ব্যাখ্যান—শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না? পরস্পরের প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করা এবং স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সাংঘাতিক বিবাদ বাঁধাইয়া দেওয়াই কি পরম পুরুষার্থ? বলিব কি,—বলিতে ঘৃণা ও লজ্জার যুগপৎ উদ্রেক হয়—যে, আমাদের প্রিয় 'ব্রাহ্মভ্রাতা' ও শিরস্তানীয় 'হিন্দুধর্ম্ম'সমর্থনকারী উভয়েই এই প্রকার পুরুষার্থপ্রয়াসী হইয়া 'আসরে' নামিয়াছেন! প্রতিমুহূর্ত্তে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, কুৎসা, মনোবাদ ও অধঃপাতের রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। ওঃ ধিক! শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালি, তোমার জীবনে!

যিনি হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাঁহার ত আমরা বিশেষ অপরাধ দেখি না। আজকালকার দিনে কে না আপনার স্বাধীন মত প্রকাশ করে? ভট্টাচার্য্যমহাশয় যাহা ভাল বুঝেন, যাহা বিশ্বাস করেন, যাহা তাঁহার স্বাধীন মত ও দৃঢ়সংস্কার তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। কাহারও নিন্দা, কুৎসা বা গ্লানি করিতেছেন না। কিন্তু ভাই মার্জ্জিত ইংরাজিনবিস! তোমরা অনর্থক দ্বন্দ্ব করিতেছ কেন? কেহ রামমোহন রায় বেচারির উপর কেহ শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেছ কেন? তোমাদের বিদ্যাবত্তা রাখিবার কি আর স্থান নাই? ইতরতায় ধীবরপল্লীকেও যে তোমরা পরাস্ত করিলে!

হিন্দুদিগের মধ্যে অসংখ্য সম্প্রদায় ত আছেই। 'ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ'ও সম্পূর্ণ প্রশস্তক্ষেত্রে আপনাদিগের 'ধর্ম্ম ধ্বজা' পত্তন করিয়াও তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। সম্প্রতি চতুর্থ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের আভাস পাইতেছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে অসংখ্য হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আর্য্যধর্ম্মের সেই একই 'অখণ্ড বীজ' দেখিতে পাই। হিন্দুব্রাহ্মে ও ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে ধর্ম্মগত পার্থক্য ত আদৌ দেখিতে পাই না। তবে তাঁহাদের মধ্যে এত আত্মকলহ কেন?—আত্মকলহ তাঁহাদের অসীম দুর্ব্বলতা ও অস্বাভাবিক স্বার্থপরতানিবন্ধন! কোন সদুদ্দেশে আত্মকলহ অবশ্য অসম্ভব।

ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম বা আর্য্যধর্ম্মের বিরোধী ধর্ম্ম বলি না। মৌলিক হিন্দুধর্ম্ম

হইতে উহা পৃথক নহে,—ইহা অপক্ষপাতী ও তদ্দর্শী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মূলসত্যের উপর স্বকীয় শরীরসংস্থাপন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম হইতেও রসাকর্ষণকরতঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে চাহেন। এ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র সেনের 'নববিধান' আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কবির কল্পনা, দার্শনিকের দর্শন, বিজ্ঞানের সত্য, যোগীর যোগ,—ধর্ম্মমাত্রের সারসত্ত্বা লইয়া উহা জীবিত থাকিতে চাহে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম, সমস্ত 'বিধান'ই উহার পূজনীয় ও ভিত্তিভূমি। আদর্শ যেমন উদার, তেমনি উচ্চ। কিন্তু হইলে কি হইবে? কেশবচন্দ্রের নিজ শিরিরেই মহাপ্রলয় উপস্থিত। যাঁহারা উচ্চধর্ম্ম প্রচারাভিলাষী, তাঁহারাই নীচতার অন্তস্তলে নিপতিত। বর্ত্তমান নববৈধানিক গণ্ডগোলে উভয় পক্ষই সমানরূপ নিন্দনীয়। মন্দিরঘটিত গোল মিটাইবার জন্য প্রতাপবাবু সে দিন সাধারণের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছেন। সাধারণে এ 'গোল' মিটাইতে কিরূপে সমর্থ, আমরা বুঝিতে পারি না। আর যাঁহারা নিজে নিজে একটা সামান্য বিষয় মীমাংসা করিতে অসমর্থ তাঁহারা কিরূপে একটা অসামান্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন ইহাও বুঝিতে পারি না। নববিধানীরা স্ব স্ব জীবনে 'খুব' সদ্দৃষ্টান্তই দেখাইতেছেন। তারপর সাধারণ ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কতকগুলি সামাজিক অপবাদ উপস্থিত। আমরা ভরসা করি, সাধারণ সমাজ এই সকল অপবাদ হইতে নিজের ধর্ম্মশরীর রক্ষা করিতে আর শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন না।

মানুষের মন স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ ইহা কে না জানে? কিন্তু স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা বিদূরিত করিবার চেষ্টা করাই কি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নয়?—ঈশ্বর ও নিরীশ্বরবাদ উভয়েরই লক্ষ্য, নয়? যদি না হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যজীবনের কার্য্য কি? উহার কার্য্য পশুবৃত্তি-উত্তেজন করা না সংযম করা? স্বার্থপর হও, সংকীর্ণ হও,—একদেশদর্শী কূপমণ্ডুক হও, ইহাই কি অতঃপর বক্তৃতা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালীকে শিক্ষা দেওয়া পরামর্শসিদ্ধ হইল? এই শিক্ষা পাইয়াই কি বাঙ্গালী মনুষ্যনামের উপযুক্ত—'আসল' মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠমনুষ্য হইবে? নারায়ণ! সকলই তোমার ইচ্ছা!!!

সাধারণীসম্পাদকের মাসিকপত্র (নবজীবন) প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আগামী বারে ইহার 'সার-সংগ্রহ' ও সমালোচনা পাঠকদিগকে উপহার দিব।

পাক্ষিকসমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল ; শ্রাবণ, দ্বিতীয় পক্ষ। [দ্বাদশ সংখ্যা।

শব্দ-শক্তি ও বাঙ্গালা ভাষা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদের চলিত বা কথিত ভাষায় বহুসংখ্যক শব্দ বিজাতীয় ভাষা হইতে সময়ে সময়ে অবকাশ লাভ করিয়াছে। কত শত কথা আমরা প্রত্যহ প্রয়োজনসাধনার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, অথচ সে গুলি আমাদের নহে। হাজার হাজার শব্দ বিলাতীয়—বিজাতীয়। কিন্তু আবার আর এক প্রকার কথা আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা যদিও অক্ষুণ্ণ সংস্কৃত-রাজভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু সে গুলির এরূপ শোচনীয় দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, অনায়াসে তাহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। শব্দাপভ্রংশ সকল ভাষাতেই অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য। স্ত্রীলোকেরা যুক্তাক্ষর সাধুশব্দসকলকে এরূপ অবশ্যম্ভাবী স্বল্পাক্ষর করিয়া তুলিবে যে, অক্ষরশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতর ও 'হ্রস্ব-দীর্ঘজ্ঞানশূন্য মূর্খলোকের সংখ্যা সকল সমাজেই অধিক, অথচ তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত কিম্বা গোপন করিবার জন্য ভাষার প্রয়োজন। সকল পণ্ডিতেরা কিছু স্ত্রীপুত্রকন্যাবিহীন হইয়া ভাষাসংস্কার লইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের পরিবার, আত্মীয়, ভৃত্য ও প্রতিবেশী—মূর্খ, সেই মূর্খদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। পুস্তক লিখিবার ভাষা ব্যবহারকালে প্রয়োগ করিতে গেলে জগতের অর্দ্ধেকের অধিক কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় বেদবিশারদ পাণিনিযোগদেব-অমরসিংহ-পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা তণ্ডুল আপণের মার্গ অনুসন্ধান করিতেছেন, প্রভাত হইতে প্রদোষাবধি রাজমার্গে দণ্ডায়মান,—কেহই তাঁহাকে বলিয়া দেয় না। তিনি কাহার কি করিয়াছেন? তাঁহার সহিত কাহারও কি মনান্তর আছে?—না; তাঁহার সহিত কাহারও মনান্তর নাই বটে, কিন্তু তিনি ঘোর দাম্ভিকের ন্যায় কায করিতে যাইতেছেন। মৃতব্যক্তিদিগের উপর তাঁহার এত প্রগাঢ়

ভক্তি যে, জীবিত স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগের (যাহারা তাঁহার জন্য চাল, ডাল, আহরণ করিয়া বিক্রয় করিতে বসিয়াছে) সহিত তিনি বোধদুর্গম ভাষায় বাক্যালাপ করিতে চাহেন। তাঁহাকে বাজারের রাস্তা কে দেখাইয়া দিবে? অগত্যা পণ্ডিতবরকেও ইতরের সহিত ইতরভাষায় কথা কহিতে হইবে। তৎপরে শব্দাপভ্রংশের আর একটী কারণ আছে। সকলেই শীঘ্রতাকাঙ্ক্ষী। সত্বর কোন কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তাহা সকলেরই ঈপ্সিত। যাহাতে অনায়াসে ও শীঘ্র মনোভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহার সকলে যে করিতে চেষ্টা করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তৎপরে শব্দাপভ্রংশের আর একটী কারণ আছে, ভ্রমান্ধ অথবা 'আখুট্টি' (Capricious) বুদ্ধিক্ষ লোকদিগের আচার, ব্যবহার ও ভাষা, পার্শ্বস্থ ইতরসাধারণে অনুকরণ করিতে প্রায়ই চেষ্টা করে। অথচ এই বুদ্ধিক্ষ লোকেরা—বহুস্বচ্ছন্দেই হউক, রসিকতা দেখাইবার জন্যই হউক, ক্রোধবশতই হউক অথবা অন্যকোন কারণবশতই হউক—সাধুশব্দসকল অপভ্রংশ করিয়া একবারমাত্র ব্যবহার করেন। সকলে, যাহারা তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া জানে, তাঁহার অনুকরণে সেইরূপ বলিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণ ব্যতীত আরও একটী গুরুতর কারণ আছে, তাহা আমরা এই প্রস্তাবে বিবৃত করিতেছি।

শব্দবিশ্লেষ শোচনীয় হইলেও—অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য হইলেও—সংস্কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অনেক বিশ্লিষ্ট শব্দ (১) সত্বর অনুমিত হয়। নাক, চোক, কাণ, হাত, পা, গা, বুক, ছাতি,—আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কিন্তু অনেক শব্দ প্রকৃত সাধুশব্দ হইতে এত পৃথক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। যেমন ছেলে (শাবক), আঁটু (অষ্টিবৎ), চাল—চাউল (তণ্ডুল?), পেটরা (পেটক), কাপড় (২) (কর্পট ছিন্নবসন), আলনা (আন্দোলন), আর্শি (আদর্শ), পাণ (পর্ণ, পত্র) ক্ষুদ (ক্ষুদ্র), কাঁটালি (কদলী), ভাত (ভক্ত), মেজে (মধ্য), বাঙ্গাল (দরিদ্র)—(কঙ্কাল—অস্থিচর্ম্মসার, - Skeleton), কড়ি (কপর্দ্দক), গতর (গাত্র)। হয়—ক্রিয়া "হৃ"-ধাতু হইতে উৎপন্ন। ভূ—ভৈল (উত্তর বেহার), ভেল ('ভাল দরশন ভেল'—বিদ্যাপতি)। তৎপরে 'ভৈল' হইতে 'ব'র (ভ=ব+হ) লোপ পাইয়া 'হইল' হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগকে "নেড়ে" কহিয়া থাকে, তৎপরে 'পাতিনেড়ে' হইল,—ইহার অর্থ কি? "নেড়ে—ফারসী 'নাযক' নড়াযে। 'পাতি' কোথা হইতে আসিল? মুসলমানেরা চিরকাল স্বধর্ম্মাভিমানী ও দেবোপাসনাবিদ্বেষী। প্রকৃত মুসলমানেরা তাহাদের স্বধর্ম্মে বিশেষ পক্ষপাতী। এই 'পক্ষপাতী' শব্দের অনুরূপশব্দ ইতরভাষায়

(১)। যেমন যে পয়সা কিম্বা টাকাটী অনেক হাত ঘিরিয়া আইসে, সেটী অনেক ঘইয়া যায়, সেইরূপ, যে শব্দটীর প্রয়োগ অত্যন্ত অধিক, সেটীর অপভ্রংশও অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। যথা,—'কর্ণ' ও 'পর্ণ'ক্রমে 'কান'ও'পান' হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'বর্ণ'—বর্ণই' আছে, কারণ, 'বর্ণের' পরিবর্ত্তে 'রঙ্' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতুসকলের নামমাত্রই বিকৃত হইয়াছে; যথা,—সোণা, রূপা, তামা, পারা, কাঁসা, সীসা, ইত্যাদি।

(২)। 'কাপড়'—সংস্কৃত 'কার্পাস' হইতে আসিয়া থাকিবে।

'গোঁড়া' (গণ্ড)। আবার এই এক 'গোঁড়া'—শব্দ হইতে তীব্র গোঁড়ামির স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া "পাতিনেবুর" নাম ও মৃদুতার বিষয় মনোমধ্যে উদ্রেক করিয়াছে। বঙ্গদেশে স্বধর্ম্মত্যাগী মুসলমানেরা তত 'তীব্র' নহে, সুতরাং "পাতি' অর্থাৎ—মৃদু-ছোট-নয়রা (নড়বে) হইয়া গিয়াছে(১)। 'কোটা' ভিটা' কাহার অপভ্রংশ? 'প্রকোষ্ঠ' শব্দ বঙ্কিমবাবু অনেকবার "দুর্গেশনন্দিনীতে" প্রয়োগ করিয়াছেন,' 'কোটা'—ঐ কোষ্ঠ' শব্দের ভিন্নাবয়ব। 'ভিটা'—'ভিত্তি' হইতে উৎপন্ন। 'থালা'—স্থালীর' অপভ্রংশ। 'ঘটী'-ক্ষুদ্রঘট। 'গাগরী'- গর্গরী, বিদ্যানাশ-বিস্তীর্ণা, গাছ গাছ, চামা ও ক্লমক একই শব্দ। "সলিতা' শব্দটীর ইতিবৃত্ত বড় কৌতুকাবহ। 'সলিতা' আরবীশব্দ, কিন্তু ঠিক আরবী নহে, ভাষান্তরিত হইবার কালে ইহারও অবস্থার অনেক ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। 'সলিতা'—'ফতিলা'='ফতিলহ' (আরবী) 'পলিতা' এই শব্দটীর আর একটি অবয়ব। 'দাড়ী' শব্দ যে 'দন্ত' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কয় জনে জানেন? 'দাড' দাড?) 'দন্ত' শব্দের অপভ্রংশ। 'দাড়ী'—'দাড়'শব্দের ভিন্নাবয়ব। 'চুল' কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন? 'চূড়াকরণ' হইতে ক্রিয়াংশ ছাড়িয়া দিলে 'চূড' অবশিষ্ট থাকে। 'চূড' মানে কেশ, 'চূড' হইতে 'চুল' উৎপন্ন হইয়াছে। 'আচ্ছা' শব্দ কোথা হইতে আসিল? 'অচ্ছ' শব্দ সংস্কৃত অভিধানে দেখ; অর্থ—ভাল, সুন্দর। সুতরাং যখন আমরা 'আচ্ছা' বলিয়া কোন নিয়োগপালন করিতে প্রতিশ্রুত হই, তখন আমরা ঠিক ইংরাজী Very well এর অনুরূপ শব্দই প্রয়োগ করি। স্বপ্নেও হয়ত অনেকে ভাবেন না, যে 'চিঠি' শব্দ একটী সংস্কৃতশব্দ হইতে উৎপন্ন। 'চিঠি' কি তবে লিপির অপভ্রংশ? না। 'পত্র' হইতেও কিছু 'চিঠি' হইতে পারে না। কিন্তু 'চিঠি' কথা বাঙ্গালা নয়, ইহা হিন্দীশব্দ 'চিঠ্ঠি'—'চিত্রিতের' অপভ্রংশ। হস্তলিপি—চিত্রবিশেষ, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? "চিট" শব্দও 'চিত্র' হইতে সিদ্ধ। 'বোকা' শব্দ—"বকর' (হিন্দী 'বকরী'—ছাগ) হইতে আসিয়াছে। 'গোঁয়ার'—হিন্দী 'গাওয়ার'=পল্লীগ্রামনিবাসী, সুতরাং নাগরিকসভ্যতাবিহীন। 'ঘর'শব্দ 'গৃহের' রূপান্তরমাত্র।

শব্দাপভ্রংশকাহিনী অত্যন্ত কৌতুকাবহ। অন্যান্য ভাষারও এই অপভ্রংশের আধিক্য বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ভাষান্তরিত হইবার কালে বর্ণবিশ্লেষবশতঃ বাক্যবিশেষের এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে যে, শীঘ্র বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের গৃহে প্রায় "বুচকী' কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এই 'বুচকী' শব্দ না হিন্দী, না ফারশী, না আরবী, ইহা তুরস্ক হইতে পাইয়াছি। তুরস্ক ভাষায় "বুক' মানে—কাপড় বন্ধন করিবার বস্ত্র, "চা' ফারশী প্রত্যয়; 'চি'ও অল্পার্থবোধক প্রত্যয়। ঐ "বুকচি" হইতেই "বুচকী"শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণ ইহার ঠিক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, "শাদা'—'শ্বেত' শব্দের অপভ্রংশ; কিন্তু তাহা নহে। "শাদা"শব্দ ফারশী, অথচ "লাল'—লোহিতের অপভ্রংশ। ফারশীতে "লাল"

(১)। কিন্তু 'পাতি'—'পতিত'(Fallen, reprobate)হইতে নিশ্চয় আসিয়াছে। বঙ্গদেশের আধুনিক মুসলমানেরা প্রায় হিন্দুধর্ম্মত্যাগিদিগের বংশ; সুতরাং পতিত রা, 'পাতিনেড়ে' অর্থাৎ ধর্ম্মচ্যুত মুসলমান।

শব্দের অবিকল, যথা, "গুঙ্গা, "মূক"।—'সবুজ'—ফারসী, 'নীল'—সংস্কৃত ও ফারসী। 'পা'শব্দও ফারসী, যদিও সংস্কৃত 'পাদ' হইতে সিদ্ধ হইতে পারে। 'দা' শব্দ সংস্কৃত ছেদনার্থে 'দা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। আমাদের শরীরের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম সংস্কৃত শব্দসকলের অপভ্রংশ। কিন্তু 'কব্জ'—ফারসী, 'কব্জ'—আরবী প্রকোষ্ঠ,) "বাজু'—ফারসী "বাজু" গেজে, গেজী (সাবনিকর্দ, 'শিখ' গুরুনানকবাসী নানকশিষ্য) শব্দ হইতে উৎপন্ন। "দস্যু" হইতে 'দাসের' উৎপত্তি অনেকে স্বীকার করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে আমাদিগের উপাধি 'দাস'—'দস্যু' শব্দ হইতে আইসে নাই। 'কিস্মারো তন্ত্র চুরা নকর', বাঙ্গালা অপভ্রংশ 'নফর' ও ফারসী 'চাকর' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কিঙ্করীর স্থানে 'দাই' প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই 'দাই'—'দাসীর' অপভ্রংশ। চম্পারণ প্রভৃতি তিলাধ্যাংসের নাম 'সগৌতী', সাহাবাদ ও অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলে "সালন" ও "গোস্ত" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'সগৌতী' শব্দের মধ্যে সংস্কৃত 'প্রগন্তি' এরূপ স্ফুটপ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে, দেখিতে পাইয়াও ধরিতে পারা বড় সহজ নহে। "গোস্ত" শব্দ বাঙ্গালাদেশে গোমাংসই বুঝাইয়া যায়, কিন্তু ফারসী ভাষায় 'গোস্ত' সকল মাংসকেই বুঝায়।১ "ঝিকমিক" শব্দ কোথা হইতে আসিল?—ইহা তুরকী "চিকমীরকের" রূপান্তর। "শতরঞ্চ" খেলা "চতুরঙ্গের" (পারসী) অপভ্রংশ, মুসলমানেরা আমাদের জিনিস লইয়া ফিরাইয়া দিবার কালে উহার ঐরূপ দুর্দ্দশা করিয়া দিয়াছে। 'তাস'শব্দ তুরকী, "তাস" মানে রাজা, বন্ধু ও ভৃত্য, কারণ তাসে রাজা (সাহেব), বন্ধু (বিবি) ও ভৃত্যের (গোলাম) প্রতিকৃতি আছে। "তাস" অবিকল ইংরাজী Coat-Cardsএর অনুবাদ। অনেকে মনে করেন, তাস সম্পূর্ণরূপে বিলাতী জিনিস। কিন্তু বহুকাল অবধি Charles VI এর পূর্ব্বে আসিয়াবাসিগণ Gangifa খেলিয়া আসিতেছে। 'তোপ' শব্দ তুরকী 'বন্দুক', আরবী 'তুরুক' মানে—ফৌজ=সৈন্য। "কীস্তি মাৎ"—ফারসী 'মারডালনা', মাৎ—মৃত্যু। সামাৎ' রাজা মরিয়াছে(ফারসী)। 'মিঠাই'-'মিষ্ট' হইতে উৎপন্ন। 'চিনি' কোথা হইতে আসিল? চীনদেশ হইতে কি আমরা 'চিনি' পাইয়াছি? মুসলমানেরা আমাদের অনেক শব্দ চুরী করিয়াছে, তাহারা চিনিকে 'শক্কর' কহে। 'শর্করা' সংস্কৃতশব্দ, ইংরাজী Sugar ও লাটিনভাষাতেও ঐ রূপ শব্দ আছে। বোধ হয়, 'চীন' বলিয়া এক প্রকার ইক্ষুদণ্ডজাতীয় 'খাগড়া' (খগোড) আছে, তাহার নাম হইতে 'চিনি' উৎপন্ন হইয়াছে। 'দাড়ি'শব্দ কি 'দৃঢ়' শব্দের অপভ্রংশ? কি নিয়মে যে অপভ্রংশ ঘটিয়া থাকে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। 'ঘৃত' ও 'দধি' শব্দ এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের ক্ষুদ্র দেহ বিকলাঙ্গ করা ভাল কর্ম্ম হয় নাই। স্বয়ং 'ক্ষুদ্র' শব্দেরও নিস্তার নাই, 'ক্ষুদ্র' শব্দ হইতে আমরা 'ক্ষুদ' পাইয়াছি (ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি)।

উপরি-উক্ত শব্দাপভ্রংশ হইতে এই স্থলে যে কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা কোনক্রমে ন্যূন নহে। সে কারণটী—ভিন্নদেশীয়দিগের প্রভুতা। যখনই কোন দেশ বিদেশীয়-করকবলিত হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ভাষার অনেক দুরবস্থা হইয়া থাকে।

ইংরেজদিগের Saxon ভাষা এক সময়ে ব্যাকরণসম্বন্ধে ঠিক সংস্কৃত, লাটিন্ ও গ্রীক ভাষার সমকক্ষ ছিল, কিন্তু Norman জাতিরা যখন ইংলণ্ড জয় করিল, Saxon ভাষার দুর্গতির সীমাপরিসীমা রহিল না। বিদেশী রাজা ও রাজপুরুষেরা বিজিতদিগের ভাষা, ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া কিছু রাজ্য করিবেন না, 'যেন তেন প্রকারেণ' বিজিতপ্রজাদিগের নিকট কর ও ভৃত্যের কার্য্য আদায় করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা সে ভাষায় বিজিতপ্রজাদিগের সহিত কথোপকথন করিবেন, তাহা যে অগত্যা অপভ্রংশসঙ্কুল হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? এমন কি এই খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশেও দেখিতে পাইবে, সভ্যচূড়ামণি ইংরেজরাজপুরুষ ও কর্ম্মচারিগণ বিজিতভাষা সম্যকরূপে শিখিয়া রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছুক নহেন। স্বীকার করি, ইংরাজদিগের মধ্যে অনেক সুপণ্ডিত লোক আমাদের সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আদর করিয়া থাকেন, স্বীকার করি, অনেকে অলৌকিক অধ্যবসায়সহকারে বিলুপ্তভাষালিখিত শব্দসকলের সার্থকতা দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, স্বীকার করি, ৩৪ টী অক্ষরমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক মৃতভাষায় বর্ণমালা প্রস্তুত করতঃ ইংরেজ পণ্ডিতেরা Edicts of Asoka পড়িতে সক্ষম হইতেছেন,—কিন্তু আমরা তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। আমরা সাধারণ ইংরেজ রাজপুরুষ, ও রাজকর্ম্মচারিদিগের বিষয় বলিতেছি। রাজকর্ম্মচারী সিভিলিয়ানদিগের প্রথম কর্ত্তব্য,—প্রজাবর্গের ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা। এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সিভিলিয়ানদিগের নিকট যদি তাদৃশ মনোরম পদার্থ হইত, তাহা হইলে ১০০০৲, ২০০০৲, ৩০০০৲ সহস্র মুদ্রা কি জন্য পাস-উৎকোচ নির্দ্ধারিত থাকিবে?

সে যাহা হউক, বিদেশী রাজার রাজ্যকালে দেশীয় ভাষার বড় শোচনীয় অবস্থা হয়। এমন কি, ইংরেজেরা যখন প্রথম রাজ্য আরম্ভ করেন, তখন আমাদের ভাষা লইয়া ঐরূপ আরম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদেবী—Ganges হইয়া পড়িলেন, বারানসী—Benares, দুর্জ্জয়লিঙ্গ—Darjiling, মথুরা—Muttra হইল। মুসলমানেরা যে করিবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জনীয়। মুসলমানেরা আমাদের দেশে আসিবার অগ্রেই দেশের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল, আর্য্যভূমি 'ভারতবর্ষ' 'হিন্দুস্থান' হইয়া গেল। 'হিন্দু'—'সিন্ধু'শব্দের পারস্যাবয়বমাত্র, 'স্থান'—ফারশী ও সংস্কৃত উভয়ভাষার কথা। তৎপরে, মুসলমানেরা যেখানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, সেইখানে স্বাভিমত স্বভাষানামধেয় হয় 'আবাদ', না হয় 'গড', না হয় 'পুর', না হয় 'নগর', না হয় 'সহর' স্থাপনারম্ভ করিল। হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ—একেবারে বিলুপ্ত। আর যেস্থানে সংস্কৃত ভিত্তি কিছু কঠিন দেখিল, সেখানে কিয়দংশও ভাঙ্গিয়া দিল। অযোধ্যা—'আউদ' হইল; কান্যকুব্জ—'কনোজ'; প্রয়াগ—'আলাহাবাদ' (আল্লা-কা-আবাদ); পাটলীপুত্র—'পাটনা,' 'আজিমাবাদ', হরিহরছত্র'—'হাজিপুর'। যেখানে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিল, সেই স্থানের নাম অমনি 'ফতেপুর' 'ফতেগড়' 'ফদিয়াবাদ' স্থাপন করিল। এমন কি, স্থানবিশেষের দেশীয় নামও তাহাদের এমন শ্রবণকঠোর বোধ হইত যে, 'ঢাকা' ও 'চট্টগ্রাম' পর্য্যন্ত এড়ান পায় নাই। অধিক

কি, ঘণ্টাকতকের জন্য কলিকাতা অধিকার করিয়া সিরাজুদ্দৌলা প্রাসাদনগরীর নাম বদলাইয়া দিয়াছিল। 'বকাসুর সহর',—বক্সার হইয়া গেল।

যেরূপ নগর নগরীর নাম লইয়া অত্যাচার করিয়াছিল, মনুষ্যের নাম লইয়াও ঐরূপ করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমানধর্ম্মাবলম্বন করিলে যে, কেবল জাতি হারাইত, এমন নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নাম পর্য্যন্ত হারাইত। অস্মদ্দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ Michael, Gubriel, Peter, Godnee হইয়াও পিতা মাতাদত্ত নাম ও উপাধি একবারে ছাড়িয়া দেয় না। মান্যবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে আমরা K. M. Banerjee-মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে দেখিতে পাই। কিন্তু মুরসেদ কুলীখাঁ, কালাপাহাড় ও চেতমলের ধমনীতে যে আর্য্য বৈদিক পিতৃপুরুষদিগের শোণিত ধাবিত হইয়াছিল, কে বুঝিতে পারে? শেষ বঙ্গদেশাধিপতির রাজ্য গ্রাস করিবার কালে মুসলমানরাজ তাঁহার নামটীও এরূপ গ্রাস করিয়াছিল, যে, ছয় শত বৎসর পরে মহানুভব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলালবাবুর কটাক্ষপাতে সে গ্রহণ ছুটিয়া যায়। 'লছমণিয়া' মানে কি? লক্ষ্মণ সেন—শেষ বঙ্গাধিপের পিতা, সুতরাং 'লছমণিয়া'—'লাক্ষ্মণেয়'শব্দের ভীষণ অপভ্রংশ।

বিদেশীয়েরা যে লোকের নামধাম লইয়া এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা সকল সময়ে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করিয়া নহে; অনেক সময়ে বিদেশীয়দিগের নিজভাষার বর্ণদরিদ্রতানিবন্ধন এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আরবী ভাষায় 'প' ও 'চ' একেবারে নাই; সুতরাং 'প'অক্ষরযুক্ত শব্দ অন্য কোন অক্ষরদ্বারা উচ্চারণ করিবে। 'ফারসী শব্দ—আরবী। 'পারসিক'শব্দ মনু-বসুবংশে লক্ষিত হয়। অশ্বত্থবৃক্ষের একটী নাম 'পিপ্পল,' ফারসী ও আরবীভাষায় তাহার নাম 'বীলকিল'। আজকাল ইংরেজেরা যে সকল দেশীয় শব্দ ভিন্নাবয়বে ব্যবহার করেন, তাহার কারণ ঐরূপ। ইংরাজী ভাষায় আমাদের 'ক'-বর্গের ও 'ট'-বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণ একবারে নাই। 'চ'-বর্গের মধ্যে কেবল 'জ' টী আছে। 'প'-বর্গের প্রথম তিনটী অক্ষর ও 'ম' টী আছে। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগের ভাষার শব্দ উচ্চারণ করিতে গেলে প্রায় বিফল হন। Scotlandবাসী অনায়াসে 'তোমার দাদা' উচ্চারণ করিবে, কিন্তু ইংলণ্ডবাসী বহুকষ্টেও 'টোমার ডাডা' ছাড়িতে পারিবেন না!

এই বিজাতীয় অধিকারই অনেক বাঙ্গালা শব্দাপভ্রংশের প্রধান কারণ। মুসলমানরাজা ও মুসলমানভূস্বামী হিন্দু-প্রজা ও রাইয়তদিগের সহিত কথোপকথন করিবার কালে অনেক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শব্দ হয় একবারে লৌকিক ভাষা হইতে অপসারিত করিল অথবা এরূপ বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিল যে, তাহা এখন অনুমান করা দুর্ঘট। 'মৃণালিনী'গ্রন্থে বঙ্কিমবাবু যাবতীয় রাজকর্ম্মচারিগণের সংস্কৃতনাম পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এজ্‌লাস, মুনসেফ, হাকিম, হুকুম, নালিশ, শালিস, উকীল, মোক্তার, আসামী, ফরিয়াদী, ইস্তাহার, হাজের, হুজুর, খোদাবন্দ, হাজত, বরকন্দাজ, চাপরাসী, আইন, কানুন, সুলেনামা, ফৌজদারী, দেবানী,—ও আরও কত শত শব্দ কখন কি লোপ পাইবে? কে

বড় কর্ম্মচারিদিগের নাম এক্ষণে ইংরাজী, সুতরাং ঈপ্সিত হইলেও তাঁহাদের সংস্কৃত নাম পুনরুজ্জীবিত করা কঠিন। মহারাষ্ট্র-জাতি যে সময়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়াছিল, তখন তাহারা অনেক সংস্কৃতশব্দ পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিয়াছিল। তাহাদের 'প্রতিনিধি' 'সেনাপতি'—মুসলমানী তত্তৎ শব্দের প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু 'পেশোয়া' কোন ভাষার কথা? সংস্কৃত নয়,—পারসী, মানে 'অগ্রগামী সর্দ্দার'। মুসলমান-অধিকারকালে বঙ্গদেশে একজন হিন্দুরাজা বাস করেন, তাহার নাম 'গণেশ'; মুসলমান ইতিবেত্তা তাঁহাকে রাজা 'ক্যানস' (Kans) বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গীতালয়।

আইস, পাঠক, তোমাকে এক সঙ্গীতালয়ে লইয়া যাই। সেখানে মৃদঙ্গ, বীণা বা বংশী নাই, অথচ জগতমনোহারিতালমান-বিশুদ্ধ মধুর বাদ্য শুনিতে পাইবে। তথায় কোন সঙ্গীতশাস্ত্রপারদর্শী গায়ক নাই, তথাপি যাহা শুনিবে, তাহা কখন ষড়জ-মধ্যমাদি গ্রাম, কখন ভৈরবী বা নটনারায়ণ আর কখন বা ললিত ও বসন্ত রাগিণী। তুমি, ইচ্ছা করিলে, সেখানে কোকিলের মধুর কূজন, অশ্বের হেষারব, গজের বৃংহিত অথবা ঋষভের কর্কশ কণ্ঠ শুনিতে পাইবে। সেই বিশ্ব-সঙ্গীত-মন্দিরে কখন বা শিশুর কাকলী শুনিয়া স্নেহ আর্দ্র হইবে, কখন বা যুবতীর মধুর সম্ভাষণ ও যুবকের সরস শব্দে আত্মবিস্মৃত হইবে আর কখন বা বৃদ্ধের জ্ঞানধর্ম্মপূর্ণ বাক্যে পুলকিত হইবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যেখানে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বর, সুর ও সঙ্গীত শুনা যায়, সেখানে একটীমাত্র যন্ত্র আছে এবং সেই যন্ত্রও দেখিতে এত সামান্য যে, তাহার এত ক্ষমতা আছে বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না।

সমগ্র মন্দিরের বর্ণনা করিব না, কেবল যে যন্ত্রটী দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গান গীত হয়,

যাহাদ্বারা সকল বাদ্যই বাদিত হয়,—দুই এক কথায় তাহারই ব্যাখ্যা করিব।

দুইটী নল। একটীর উপর আর একটী খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। একটী নল যে অপর টীর উপর আঁটিয়া বসিয়াছে, তাহা নহে। ঢিল্‌ঢিলাভাবে পরস্পরের মুখ জোড়া, মধ্যে চামড়ার দড়ির বাঁধন। অর্থাৎ দুই গাছি চামড়ার দড়ির দ্বারা নীচের নলটীর মাথা ও উপরের নলের নিম্নভাগ বাঁধা আছে। দড়ি দুইগাছি আবার এমনই ভাবে বাঁধা যে, তাহাদের একপ্রান্ত নীচের নলের মাথার পশ্চাদ্ভাগে আর অপর প্রান্ত উপরকার নলের তলার সম্মুখভাগে বাঁধা, সুতরাং উপরের নল বা নীচের নল সরিয়া গেলেই দড়ি দুগাছিতে টান পড়ে। তখন, সেতারের তার টানিয়া বাঁধিলে যেমন খন্ খন্ শব্দে বাজে এ দুইগাছিও সেইরূপ বাজিতে থাকে।

বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের মত ইহাতে বাতাস সঞ্চয় করিবার আধার আছে। বাদ্য যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বাতাস চাপিয়া তুলিয়া দিলে ঐ বাতাস বাহির হইয়া যাইবার সময় যেমন ধাতুনির্ম্মিত পাতের উপর লাগিয়া ভোঁ ভোঁ সুরে বাজনার শব্দ উৎপন্ন করে, এখানেও বাতাস নীচে হইতে উঠিয়া বজ্জু দুই গাছির উপর লাগিয়া সেইরূপ শব্দ উৎপন্ন করিয়া থাকে। আবার বাদ্যযন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বন্ধ্র চাপিয়া যেমন নানাপ্রকার গান বা গত্ বাজান যায়, এই যন্ত্রটীর মুখে এক খানি কোমল জিহ্বা ও কতকগুলি হাড়ের দাঁত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নাড়িয়া নানাপ্রকার গত্ গাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি, পাঠক, বিশ্বাস করিবেন যে, এই যন্ত্রদ্বারা জগতের সকল দেশের সকলপ্রকার রাগরাগিনী গীত হয়? আমি কিন্তু জানি যে, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার সুরে আমরা কখন ভীত ও স্তম্ভিত হই, কখন আহ্লাদে নাচিয়া উঠি, কখন আশায় উৎফুল্ল হই, কখন বা নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হইয়া পড়ি। এই যন্ত্রের সুরে সর্ব্ব প্রকার পশুপক্ষীর শব্দ উৎপন্ন হয়। গ্রীক্, লাটিন্ ও সংস্কৃত ভাষা ইহারই শব্দানুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে. আর যে বাঙ্গালাভাষায় এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তাহাও এই যন্ত্রের একখানি গত্‌মাত্র। ইহার নাম স্বর-যন্ত্র বা সুর যন্ত্র।

মানুষের নীচে যত প্রকার জন্তু আছে তাহাদের মধ্যে উচ্চবিভাগের কতকগুলির এই যন্ত্র থাকাতে তাহারা নানাপ্রকার শব্দ করিয়া ভয়, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক ভাব জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু কেবল মনুষ্যগণের মুখমধ্যেই এমন উপায় করা আছে যে, আমরা কেবল কিচ্‌মিচ্ শব্দ না করিয়া দন্তজিহ্বাদির সাহায্যে সুশ্রাব্য ও অর্থযুক্ত ভাষায় কথা কহিতে পারি।

যদি কোন পাঠক অনুগ্রহ করিয়া নিজের গলার ঠিক মধ্যস্থলে অঙ্গুলীদ্বারা স্পর্শ করেন, তাহা হইলে একটী মটরের মত বড় ও কঠিন উচ্চস্থান অনুভব করিতে পারিবেন। যাঁহাদের গলায় এই স্থানটুকু অপেক্ষাকৃত বড়, জলপান করিবার সময় তাঁহাদের এই অংশটী যে অতিসুন্দরভাবে উঠিতে ও নামিতে থাকে,—তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই উচ্চস্থানের অব্যবহিত উপরে একটী গর্ত্ত আছে, ঐ গর্ত্তে একটী

অঙ্গুলী দিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা কহিলে দেখা যায় যে, অঙ্গুলীর উপরে একটী ও নীচে আর একটী নল আছে, কথা কহিবার সময়ে উপরকার নলটী একবার অগ্রে একবার পশ্চাতে যাইতেছে।

এই দুইটী নলের কথাই উপরে বলিতেছিলাম। ইহারাই স্বরযন্ত্রের মূল ও ভিত্তি, আর যে দড়ি দুই গাছির কথা বলিয়াছি, তাহাদের নাম স্বর-রজ্জু।

রামায়ণ কথকের ন্যায় গম্ভীরস্বরে আ-আ-আ শব্দ করিলে উপরকার নল অগ্রদিকে সরিয়া যায়, সুতরাং স্বর-রজ্জুর উপর টান পড়ে। আবার যখন বিকৃত হইয়া শীঘ্র তীক্ষ্ণস্বরে 'আঃ' বলা যায়, তখন উপরকার নল পিছনে হটিয়া যায়, সুতরাং স্বর-রজ্জু শিথিল হইয়া পড়ে।

এইরূপ স্বর রজ্জুদুইটী কখন সটান কখন শিথিল থাকে। কখন দুইটী রজ্জু কাছাকাছি আসাতে তাহাদের মধ্যে আর স্থান থাকে না, সুতরাং কণ্ঠনলীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়, কখন রজ্জুদুইটী পার্শ্বে পার্শ্বে সরিয়া যাওয়াতে তাহাদের মধ্যে অনেক স্থান হয়। স্বর-রজ্জুদুইটীর এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সুর বা স্বর উৎপন্ন হয়।

কাশি বা হাঁচি হইবার সময়ে আমরা স্বররজ্জু দুইটী কাছাকাছি করিয়া কণ্ঠনলের মুখ বন্ধ করিয়া দিই, অথচ নীচে হইতে বাতাস উঠিয়া জোরে তাহাদের মুখ খুলিয়া দেয়। সেই জন্যই খক্ খক্ শব্দ হয়। যদি বাতাস মুখ দিয়া বাহির না হইয়া নাক দিয়া বাহির হয়, তবে খক্ খক্ শব্দ না হইয়া হিঁচ্‌হিঁচ্ শব্দ হয়।

এখন জানা উচিত, স্বর কিরূপে উৎপন্ন হয়। যখন ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলি, তখন প্রায় কোন শব্দই শুনা যায় না। এই সময়ে স্বররজ্জুদুইটী শিথিল ও তাহাদের মধ্যস্থল প্রশস্ত থাকে। যদি স্বররজ্জু দুইটীর এই শিথিল অবস্থায় অতিবেগে শীঘ্র শীঘ্র প্রশ্বাস ত্যাগ করি, তাহা হইলে স্বররজ্জুর উপর সেই বাতাস লাগিয়া এক প্রকার অব্যক্ত 'হাঃ হাঃ' শব্দ শুনা যায়। আমরা যখন জোরে পাখার বাতাস খাই, তখন এইরূপ শব্দ শুনা যায় এবং কুকুরেরা ক্লান্ত হইয়া জিহ্বা বাহির করিয়া এইরূপ শব্দ করে। ইহা সুর নহে, কেবল শব্দমাত্র। ছাপরের শব্দ এবং রেলগাড়ী ছাড়িলে তাহার ধূমের শব্দ এইরূপ অব্যক্ত। যদি স্বর উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে শ্বাসযন্ত্রের উপরকার নল ঠেলিয়া বাহিরের দিকে লইয়া যাইতে থাকি, সুতরাং স্বররজ্জু দুইটীর উপর টান পড়ে এবং তাহাদের মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ হয়। এখন ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকি, সেই প্রশ্বাসের বায়ু দৃঢ়বদ্ধ রজ্জুর উপর আসিয়া লাগিতে থাকে। তখন, যেমন সেতার বা বেহালার তার বাঁধিয়া নাড়িলে ঐ তার কম্পিত হইতে থাকে এবং চারিদিকের বায়ুকে তাড়না করিয়া শব্দ উৎপন্ন করে, সেইরূপ স্বররজ্জু কম্পিত হইয়া নিকটস্থ বায়ু তাড়না করিতে থাকে, এবং তাহাকে হাঃ হাঃ (জোরে নিশ্বাস ফেলার ন্যায় অব্যক্ত) শব্দ উৎপন্ন না হইয়া আ, আ, আ, এইরূপ সুর উৎপন্ন হয়।

ছুঁচার কিচ্‌মিচ্, কাকের কা কা প্রভৃতি সুর বা স্বর এবং মনুষ্যের রোদন, গান ও দুরাহ্বানের প্রভৃতস্বর—সকলই স্বররজ্জুর প্রকম্পনদ্বারা সমুৎপন্ন হয়। সুরের মাত্রা

পঞ্চম, সপ্তম প্রভৃতি সকলই কেবল স্বর-রজ্জু দুইটীর মধ্যস্থলের সঙ্কীর্ণ বা বিস্তৃত হওয়াতেই হয় কেবল দুইগাছি তার ঢিলা ও কঠিন হইয়া মনুষ্যকণ্ঠে যেরূপ নানা প্রকার স্বর উৎপন্ন করিতে পারে, এমন আর কোন বাজনাতেই দৃষ্ট হয় না। সহজ-নিশ্বাস ফেলিবার সময় স্বরবজ্জু দুইটী শিথিল ও ইহাদের মধ্যস্থিত স্থান প্রশস্ত থাকে, সুতরাং প্রত্যেক বার নিশ্বাস প্রশ্বাসে বিস্তর বাতাস যাইতে আসিতে থাকে। কিন্তু যখন কথা কহিবার জন্য শব্দ করি, তখন রজ্জু দুইটীতে টান পড়ে, তাহাদের মধ্যস্থল সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং অতি সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাতাস যাইতে থাকে সুতরাং একবার প্রশ্বাসে যত বাতাস বাহির হইয়া যাইত তাহা আস্তে আস্তে বাহির করিয়া—অল্পে অল্পে খরচ করিয়া দশপনরটী কথা কহিয়া লই। এই জন্য, সা রি গা-মা সাধিতে—সা, রি ভাঁজিতে যেমন ঘন ঘন দম ফেলিতে হয়, গা, মা, পা, প্রভৃতি উচ্চশব্দ করিতে তত শীঘ্র দম ফেলিতে হয় না। তাহার কারণ এই যে, প্রথম কয়টী ভাঁজিবার সময় স্বররজ্জুর মুখ শিথিল থাকে, তখন শীঘ্র শীঘ্র বাতাস বাহির হইয়া যায়; কিন্তু গা, মা প্রভৃতি উচ্চশব্দ করিতে মুখ দুইটী কাছে কাছে আসে, তখন ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া অনেকক্ষণে অল্প বাতাস বাহির হয়। আবার যখন ধীরে ধীরে সা-রি-গা মার সা হইতে নী পর্য্যন্ত উঠিতে থাকা যায়, তখন স্বররজ্জু দুইটী প্রথমে শিথিল থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে শব্দ যত উচ্চে উঠিতে থাকে ততই সঙ্কীর্ণ হয়।

উপরে জানিলাম যে, স্বর-রজ্জুর উপর বায়ুর আঘাত পাইয়া সুর উৎপন্ন হয়; সেই সুর কেবল মানুষে নহে, অন্যান্য জন্তুগণও উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু মানবগণের বাক্‌শক্তি কিরূপে হইল তাহা দেখা উচিত।

ব্যাকরণে যাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ কহে, তাহা উচ্চারণ করিতে পারাই বাক্‌শক্তির মূল। অ, আ, প্রভৃতি সকল স্বরবর্ণই স্বর-রজ্জু দ্বারা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে মুখগহ্বর, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থান আবশ্যক। দেখ, স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে কোন ক্লেশ নাই, মুখের কোন সাহায্য আবশ্যক নাই, মুখ খুলিয়া স্বর-রজ্জু কাঁপাইয়া স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করিতে পার। কিন্তু মানবগণের মুখগহ্বর এমনই সুন্দররূপে রচিত যে, যখন স্বর-রজ্জুর উপর দিয়া বাতাস স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া বাহিরে পলাইবার চেষ্টা করে, তখন মুখমধ্যে তাহাকে বাধা দিয়া আমরা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিয়া লই। গোমহিষাদি অ-বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে, কোকিল উ-বর্ণ উচ্চারণ করে, আর মানবগণ ওষ্ঠদ্বারা এই সকলকে বাধা দিয়া ওম্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনুষ্য-নামের সার্থকতা সম্পন্ন করে।

সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে স্বরের সাহায্য আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে। স্বরবর্ণকে অগ্র ও পশ্চাতে না রাখিয়া কোন ব্যঞ্জনই উচ্চারিত হয় না। কেন হয় না?—তাহার উত্তর অতি সহজ। স্বর-রজ্জুদ্বারা সুর বা স্বর না করিলে তুমি কি শুনিতে পাইবে? ব্যঞ্জনবর্ণ নিজে কিছুই বর্ণ নহে, উহা কেবল স্বরবর্ণের অবস্থান্তরমাত্র। সুরকে বাধা দিয়া নূতন রকমের শব্দ উৎপন্ন করা ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ আর কিছুই নহে। সুতরাং আগে কিম্বা পাছে স্বর বা সুর উৎপন্ন না করিলে

কাহাকে বাধা দিবে? ব্যঞ্জনের স্বর কি রূপে উচ্চারিত হইবে? এখন বিশেষ নিয়ম দেখ। স্বরবর্ণ যদিও স্ববযন্ত্র বা কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বটে, তথাপি মুখমধ্যে অনেক প্রকারে ইহা রূপান্তরিত হয়। কণ্ঠ হইতে একটী রূঢ় ও অমিশ্র সুর বাহির হয়; পরে তালু জিহ্বামূল ও ওষ্ঠে উহাদের রূপান্তর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্ববর্ণ হয়। এসম্বন্ধে ওষ্ঠের সাহায্য অতি চমৎকার। 'উ' উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা কম খুলে এবং 'আ' উচ্চারণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খুলে। সুতরাং ওষ্ঠসম্বন্ধে স্ববের এই নিয়ম :—

ওষ্ঠসম্বন্ধে স্বর উচ্চারণের নিয়ম

উ——১
ঊ——২
ঔ——৩
ও——৪
ঈ——৫
ই——৬
ঐ——৭
এ——৮
অ——৯
আ——১০

'উ' বলিতে যতটুকু ওষ্ঠ খোলা আর শুক, তাহাতে কখনই 'আ' বলা যায় না।

আবার স্বর-যন্ত্র হইতে উদ্ধ'দকে আসিতে আর এক নিয়ম :—

অ, আ, হ—কণ্ঠ্যবর্ণ। ইহারা কেবলমাত্র স্বর-রজ্জুদ্বয়ের প্রকম্পনে উৎপন্ন হয়। হ—কেবল 'অ' এই বর্ণের মোটা সুরমাত্র, হ বর্ণকে ব্যঞ্জনবর্ণমধ্যে ফেলিয়া দেওয়া অন্যায়, কেননা মুখগহ্বর, তালু, জিহ্বা অথবা ওষ্ঠ—কেহই ইহার উৎপাদক নহে।

ঃ, ং—দুর্ব্বণ্যবর্ণ। সাধারণতঃ এই দুইবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের র এবং স্বরবর্ণের ই—এই উভয় বর্ণের সংযোগে যে উচ্চারণ হয়, সেই উচ্চারণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা যদি হয়, তবে ইহাদিগকে ব্যঞ্জন-বর্ণের শ্রেণীতে ফেলাই উচিত। আর যদি কেবলমাত্র স্বর রজ্জু কাঁপাইয়া ঋ এইরূপ স্বর উচ্চারণ করা সম্ভব হয়, তবে তাহাও এত কঠিন যে, অধিকাংশ লোকের নিকট এইরূপ বর্ণের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান।

৯—ইহাকে দন্ত্যবর্ণ কহে। ইহাও বিশুদ্ধ স্ববর্ণ নহে, অথবা ঋ ঋৃ ন্যায় কষ্টে উচ্চার্য্য স্বর।

উ, ঊ—ওষ্ঠ্য স্বর এবং বিশুদ্ধ স্ববর্ণ বটে।

এ—কণ্ঠতালব্য। ঐ (অর্থাৎ ও এবং ই)—মিশ্র স্বর।

ও, ঔ—কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য। ঔ (অর্থাৎ ও এবং উ)—মিশ্রস্বর।

ব্যঞ্জনবর্ণসকল আমাদিগের ভাষায় যত সম্পূর্ণ ও উচ্চারণস্থানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ম্মিত, এত আর কোন ভাষাতেই নহে। যেই স্ববর্ণ শেষ হইল, অমনি জিহ্বার মূল অলিজিহ্বার উপর আসিয়া বাতাসকে প্রথমদ্বারে বাধা দিয়া ক, খ, গ, ঘ উচ্চারণ করিল, তাহার পর জিহ্বা নিজের মূল ছাড়িয়া দিয়া মধ্যস্থলদ্বারা তালু চাপিয়া চ-বর্গ এবং প্রায় অগ্রভাগ দিয়া ট-বর্গ ও পরিশেষে অগ্রভাগ দন্তে দিয়া ত-বর্গ উচ্চারণ করিল। এইরূপে জিহ্বার সকল অংশ খাটিয়া যখন তাহার আর ক্ষমতা না থাকে তখন দুই ওষ্ঠ পরস্পর একত্রিত হইয়া প-বর্গ উচ্চারণ করে। আর কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, তাহাদিগকে অনুনাসিক কহে। ইহারা

সম্মুখে আসিতে চেষ্টা করিলে জিহ্বা ইহা দিগকে ঠেলিয়া নাসিকার ভিতর পুরিয়া দেয়। নাসিক্য ভিন্ন ইহাদের উচ্চারণ হয় না।

স্বর ও ব্যঞ্জনকে নানা প্রকারে একত্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব জ্ঞাপন করাকেই ভাষা বলে।

যাহারা শিশুগণের বাক্যস্ফূর্তির নিয়ম ও ক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন—বাক্যোচ্চারণ ও ভাষা শিক্ষা কত কঠিন। প্রথম কয়েক মাস কেবল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া শিশু ক্রমে সরল ব্যঞ্জনবর্ণ অভ্যাস করে। ক্রমে ৩৫ বৎসরকাল পরিশ্রম করিয়া ভাঙ্গা উচ্চারণ ও অসম্পূর্ণ বাক্য যুক্ত ভাষায় বালক কথা কহিতে শিখে। যাহারা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিক্ষা করে, তাহারা বহুকাল পরিশ্রম করিয়াও বিদেশীয় ভাষার সর্ব্বপ্রকার উচ্চারণ আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হয় না। মাতৃভাষার উচ্চারণ করিতে জিহ্বার স্পন্দন ও গতি যেরূপ থাকে, বিদেশীয়ভাষা উচ্চারণ করিতেও জিহ্বাদি সেইরূপ ব্যবহার করা হয় বলিয়া উচ্চারণ শুদ্ধ হইয়া উঠে না। এই জন্যই ইংরাজগণ এদেশীয় ভাষায় কথা কহিলে বড় কৌতুকজনক উচ্চারণ শুনা যায় এবং আমরা ইংরাজি বলিতে আরম্ভ করিলে নূতন আগন্তুক ইংরাজ আমাদিগের উচ্চারণ শুনিয়া বিস্মিত হয়েন।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উপর শ্রদ্ধা বা অপ্রবৃত্তিবশতঃও বিদেশীয় ভাষা উচ্চারণের ব্যাঘাত জন্মায়। ইংরেজেরা দন্ত্য-'স' যুক্ত এবং ত বর্গ উচ্চারণ করিতে ক্লেশ পান, কিন্তু ট-বর্গে তাঁহাদিগের সুখ। পারস্যদেশে বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ অধিক ব্যবহৃত হয়। উড়িষ্যাবাসিগণ অনুনাসিক বর্ণ বড় ভালবাসেন না। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বর্গের চতুর্থ বর্ণের পরিবর্ত্তে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারিত হইতে দেখা যায়।

ভাষা উচ্চারণের প্রধান ব্যাঘাত দন্ত ও জিহ্বাহীনতা। দন্তহীনতাবশতঃ শিশু ও বৃদ্ধগণের উচ্চারণ বড়ই অসম্পূর্ণ হয়, কিন্তু জিহ্বা কিয়ৎপরিমাণে কাটিয়া ফেলিলেও উচ্চারণের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

কিন্তু যদি এই সকল সহকারিবস্তুর অভাব বা অসম্পূর্ণতা না থাকে, যদি স্বর-রজ্জুদ্বয় সুস্থ থাকে এবং সঙ্গীতশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের যেরূপ কখন শিথিল, কখন কঠিন, কখন বিস্তৃত কখন সঙ্কুচিত অবস্থা করা প্রয়োজন, সেইরূপ অবস্থা যদি একবার অভ্যস্ত হইয়া যায়,—তাহা হইলে এই দুইগাছি রজ্জুর তুলনীয় পদার্থ এজগতে আর কিছুই থাকে না। ভাষা—যে ভাষার নিমিত্ত মনুষ্যগণ অন্যান্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ, সেই ভাষা—এই স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যে কণ্ঠস্বর বিহঙ্গগণের কণ্ঠে এত মধুর এবং যাহা মনুষ্যকণ্ঠে মধুরতর বোধ হয়—সেই কণ্ঠস্বর এই রজ্জুদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয়। যে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া জীব-মাত্রেই পুলকিত হয়, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য কখন ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময়চিত্ত হয়, কখন উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতে থাকে, কখন বা দুঃখে গলদশ্রু হইয়া উঠে—এই রজ্জুদ্বয় সেই সঙ্গীতের আকর। গোঁসাই হরিদাসের সঙ্গীতে যে পক্ষিগণ মুগ্ধ হইয়া শুনিতে আসিত, অর্ফিয়ুসের (Orpheus) সঙ্গীতে যে জড় পদার্থ চঞ্চল হইত, তানসেনের সঙ্গীতে যে ভারতবর্ষ মুগ্ধ হইত,—সে কেবল এই রজ্জুদ্বয়ের গুণে। রোমের

বাদ্যযন্ত্রের বাজনা শুনিয়া কে ইহা অপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হইয়াছে?—কোন্ সঙ্গীতালয়ে কেহ ইহা অপেক্ষা উত্তম সঙ্গীতযন্ত্র দেখিয়াছে?

শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৺কৃষ্ণদাস পাল।

একি কথা শুনি আজি। ভারতের বুকে
শেল-সম এ কথা যে দারুণ বাজিবে।
শতপুত্র শোকাতুরা দুঃখিনী জননী
এ বিষম শোক পুনঃ কেমনে সহিবে?

নহে বহুদিন গত—সে দিনের কথা—
প্যারীর মরণশোক সহিল দুঃখিনী,
দুদিন না যেতে পুনঃ কেশববিয়োগে
মৃতপ্রায় হয়ে, হায়, পড়িল তাপিনী!

তখনি আবার শ্যাম মর্ত্ত পরিহরি
কাঁদায়ে ভারতমায়ে গেলেন চলিয়া।—
সে মূর্চ্ছা যেন ভাঙ্গিতে একি কথা শুনি,—
কৃষ্ণদাস গেছে, হায়, দিক আঁধারিয়া।।

নিদয় বিধাতঃ! বল, একি রীতি তব,?
এ দৃশ্যে কি গলে না গো হৃদয় তোমার?
দুঃখিনী যে মরিতেছে অমা-অন্ধকারে!—
সে আঁধারে কেন পুনঃ জলদসঞ্চার?

শোকের তরঙ্গচয় উপরি উপরি
আঘাতিছে ভারতের হৃদয়বেলায়।—
হায়, কত দিনে, বিধি, প্রকৃতিনিয়মে
ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা? বল গো আমায়।

গেলে চলি, কৃষ্ণদাস, ভারত কাঁদায়ে।
রাজনীতি কে বুঝিবে তোমার মতন?
মাতৃভূমিদুঃখ দূর করিবার তরে,
কে আর গো নিয়োজিবে আপন জীবন?

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলে, কৃষ্ণদাস,
গুণযোগ্য মান তুমি পেয়েছ জগতে,
তোমার সমান গুণী—দক্ষ তব সম
একটীও নাই আজি, কাঙাল এ ভারতে।

তাইতে গো বিধাতার সহিল না বুঝি!
তোমা হেন রত্নে তাই করিল হরণ?
তব তরে দিবানিশি ভারতমাতার—
ভারতবাসীর অশ্রু হইবে পতন!

কে না জানে শমনের কঠিন হৃদয়
গলে না পরের দুঃখে?—কিন্তু তা বলিয়া
সে জ্ঞানপ্রভাবে, বল ক'জনের, হয়
পতন-উন্মুখ-অশ্রু নয়নে লাগিয়া?

বৃদ্ধ পিতামাতা তব—বালিকা বিধবা—
ইঁহাদের ছাড়ি, কৃষ্ণ, চলিলে কোথায়?
কোন্ প্রাণে, কি সান্ত্বনে, কি সুখের আশে—
থাকিবেন তাঁরা আর এ পাপধরায়?

আঁধারের আলো তুমি দেশ আঁধারিয়া
গেলে চলি, কৃষ্ণদাস, দুর্দ্দিনে অকালে।
বিধাতা হে, মন-আশা পূরে নি কি তব?
না জানি আর(ও) কি আছে ভারতের ভালে।

যাও তবে, ভারতের আশা তুমি, যাও,—
বিধির লিখন মোরা পেরেছি বুঝিতে,
পুত্রশোক বুকে করি হইবে বহিতে।
ভারতের—লঙ্কা যথা রাবণের চিতা—

হায়রে যাতনা এত সহিবে কেমনে?
প্রতিকার নাহি এর।—দৈববিড়ম্বনা!
সকল দুঃখের শেষ আছে,—সবে জানে,—
মিথ্যা কথা, ভারতের অনন্ত বেদনা!

শ্রীহে :—

পাখী।

১

কে প্রধান এ জগতে? মানব, না, তুমি পাখি?
যে কহে অধম তোরে,
সে নাহি বুঝিতে পারে,—
কত সুখে সুখী তুমি সংসারের ঊর্দ্ধে থাকি।

২

স্বভাবের প্রাণী তুমি, সতত স্বভাবে থাক।
যে আশা যখনি বুকে,
তখনি মিটাও সুখে,
মুহূর্ত্তের তরে নাহি অভাব হৃদয়ে রাখ।

৩

ধরার রাজেন্দ্র হ'তে সম্পদ তোমার, পাখি!
শূন্য-মর্ত্ত চারিধার,—
সবি তব অধিকার,
অবিরত ভ্রম তুমি, জগতের সুধা মাখি।

৪

বহিতে দীনের ঊর্দ্ধে ধনবান এ সংসারে,
ঐশ্বর্য্য প্রবাহ ঢেলে
অভ্রভেদী সৌধ তোলে,—
তুমি সৌধশিরে বসি' উপহাস কর তারে!

৫

গঠে নর কীর্ত্তিস্তম্ভ, শিখর তুলি' অম্বরে—
সেই কীর্ত্তিস্তম্ভশিরে
চরণ পরশ ক'রে
ব'সে থাক, পাখি, তুমি আপন গৌরবভরে!

৬

ভুবন-বিজয়ী বীর— ধরা পদানত যা'র!
মানব, পূজিবে ব'লে,
তা'র প্রতিমূর্ত্তি তোলে;—
অবলীলাক্রমে, পাখি, ব'স তুমি শিরে তার!

৭

মানব যা কিছু উচ্চ ভাবে এই ভূমণ্ডলে—
কিবা শিল্প, কি স্বভাব,—
তোর কাছে পরাভব ;
বিহঙ্গ, সকলি তাহা রাখ তুমি পদতলে !

৮

প্রাণের মাহাত্ম্য কিবা বুঝিয়াছ তুমি, পাখি।
কা'রো প্রাণ নাহি চাও,
কারেও না প্রাণ দাও ;
জগত মোহিত তবু, বিহঙ্গ, তোমারে দেখি' !

৯

অধীন কাহারো নও, নিজে তুমি অধিপতি !
পুত্র পরিবার-দারা,—
সবাই সক্ষম তারা ;
মানবে শিখাও তুমি, পাখি রে, স্বাধীন গতি।

১০

এতই বৈভব তব, তবু, বাসস্থান—শাখী।
কিবা ধন, কিবা যশ—
কাহারো না হও বশ।—
কে প্রধান এ জগতে ? মানব, না তুমি, পাখি ?

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার-সংগ্রহ।

(মাসিক পত্র)।

ভারতী।—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

বিষয়।

১। ভূমিকা।
২। স্থান মান।—(বর্ষ)।
৩। ডাউসাহেবের বখর।
৪। ডুব দেওয়া।
৫। মূল্য।
৬। লীলা।
৭। সরসীজলে শশী।
৮। ন্যাশনাল্ ফণ্ড্।
৯। অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস-ভূমি কি না ?
১০। এম্ বর্ণিঙ্গার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।
১১। গোলাপ।
১২। বিলাতে ছাত্রজীবন।

ভূমিকায় নূতন সম্পাদক বলিয়াছেন, এখন হইতে ভারতীতে অপেক্ষাকৃত বহুলরূপে আলোচিত হইবে। বর্ত্তমান দুই সংখ্যার অধিকাংশ প্রবন্ধ বিশ্লেষোপযোগী নহে। ৮ম ও ৯ম সংখ্যক প্রবন্ধের মাত্র সারমর্ম্ম দেওয়া হইল।

৮। কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "ন্যাশনাল্-ফণ্ড" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-প্রবন্ধ-লেখক "ন্যাশনাল্" কথাটার মানে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন.

"ন্যাশনাল" বলিতে আমি ত এই বুঝি, সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ-উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে, যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাকে জোর করিয়া ন্যাশনাল বলিবার আবশ্যকই হয় না, কারণ, তাহা ন্যাশনাল নয় বলিয়া কাহারও মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহও হয় না"। উপস্থিত লেখকের মতে কোন কার্য্যই 'সমস্ত নেশন' বা "নেশনের অধিকাংশ" কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয় নাই ও হইবে না। ইনি ন্যাশনাল মানে এইরূপ বলিয়াছেন; 'আমি কেবল এই বলিতে চাই যে, ন্যাশনাল বলিতে সে কার্য্যই বুঝায় না, যাহা সমস্ত নেশন করিতেছে, অথবা যাহা সমস্ত নেশন হইতে স্বতঃ-উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ন্যাশনাল বলিতে তাহাও বুঝায়, যাহা একটী নেশনের বহুসংখ্যক লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়'। 'কোন একটি নেশনের উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত বা উদ্ভাবিত হয়, তাহাও ন্যাশনাল,—কোন একটি নেশনের উন্নতিকল্পে যাহা কৃত হয় তাহাও ন্যাশনাল। 'তার পর ইনি দেখাইয়াছেন যে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে ফণ্ড সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার নাম 'ন্যাশনাল ফণ্ড' দেওয়াতে কোন বিশেষ অপরাধ হয় নাই। কারণ, ইহার দ্বারা যে আন্দোলন হইবে, তাহা নেশনের উন্নতিকল্পে হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধ লেখকের, ন্যাশনাল ফণ্ডের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যাঁহাদের উপর ন্যাশনাল ফণ্ডের ভার, তাঁহারা বাঙ্গালা-অনভিজ্ঞ এবং ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাপ্রদর্শন উদ্দেশেই জীবনধারণ করিতেছেন। ইনি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, এই দোষারোপটি অন্যায়; কারণ, ইহার মূলে কোন সত্য নাই। দ্বিতীয়তঃ 'এ দোষারোপটি ন্যায়সঙ্গত হইলেও ইহা ন্যাশনাল ফণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তিস্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না'। কারণ, নেশনের কোন একটা ভাষা নাই, ইংরাজীই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরাজী সমস্ত নেশন বুঝিতে পারে না' সত্য, কিন্তু যাঁহারা নেশনের নেতা, শিক্ষাদাতা বা প্রতিনিধি, তাঁহারা ইংরাজী বোঝেন। অতএব বর্ত্তমান সময়ে দেশময়, নেশনময় কোন আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে হইলে ইংরাজীতেই তাহার সূচনা করিতে হইবে,' কেন না 'কোন প্রাদেশিক ভাষায় সূচনা করিলে,' তাহা সেই 'প্রদেশেই আবদ্ধ থাকিবে'। আন্দোলন ভারতময় বিস্তার করিতে হইলে ইংরাজিতে সূচনা করিতে হইবে, 'কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলন করিতে হইলে তাহাকে প্রদেশীয় ভাষায় পরিচ্ছদ পরাইয়া প্রদেশে প্রদেশে পাঠাইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহাই করিতেছেন'। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন খাজানার আইন সম্বন্ধে Peopleদের পক্ষে বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য দেশীয় জমিদারগণের বিরাগভাজন হইয়াছেন; এই দেখাইয়া পূর্ব্ব প্রবন্ধ লেখকের আর একটি অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

সেই অভিযোগ পূর্ব্বপ্রবন্ধ লেখক এই রূপ ভাষায় বলিয়াছেন, মুখে বলা হইতেছে Peopleরাই আমাদের সহায়, Peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, Peopleদের উপরই আমাদের ভরসা। এ সব ভাণ করিবার দরকার কি? * * * * তাহাদের (Peopleদের) জন্যের [illegible]

কোনখানে, কোনখানে ঘা পড়িলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাহা কি তোমরা জান? না, জানিতে চেষ্টার কর? শেষে দুই জনেই Political agitation বিষয়ে একমত হইয়াছেন। তাঁহাদের মত, Political agitation এ ন্যাশনল ফণ্ডের টাকা প্রধানতঃ প্রয়োগ করিলে কোন লাভ হইবে না, দেশের বড় অনিষ্ট হইবে'। তাহারা বলিতেছেন 'যদি কর্ম্ম করার ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ও ভিক্ষা চাও। গৌণ উদ্দেশ্য হয় তবেই ইহার দ্বারা আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে।' আর ইনি বলিতেছেন, "অতএব আমাদের Political agitation এর সময় আসে নাই। Political agitation এর জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে আমাদিগকে দীর্ঘকাল নিঃশব্দে কার্য্য করিতে হইবে। আমেরিকা ও য়ুরোপে পাঠাইয়া আমাদিগের যুবকদিগকে শিল্প, বাণিজ্য, অস্ত্র, শস্ত্র শিখাইতে হইবে,—দেশের বাষ্প দেশায় কলে প্রস্তুত করিতে হইবে, দেশের জাহাজ, বেলওয়ে, টেলিগ্রাফ দেশীয় লোকদ্বারা চালাইতে হইবে, দেশের কামান বন্দুক তরবারি দেশীয় লোকদ্বারা নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, ইত্যাদি। এ কার্য্যগুলি যখন আমরা করিতে পারিব, তখন আমাদের Political agitation এর সময় আসিবে। এখন আমাদের "শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয়" করা আবশ্যক। এই "শক্তি উপার্জ্জন ও 'সঞ্চয়' চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ন্যাশনাল ফণ্ড প্রয়োগ করিতে পারেন। এবং ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিয়নও এই "শক্তি উপার্জ্জন ও সঞ্চয়" [illegible] মহারাজার মহারাজা ও "চিরস্থায়ী অন্নদেশবৎসল লোকদ্বারা ইণ্ডিয়ান ইয়ুনিয়ন চালিত হইয়াও যদি ইহাতে অসমর্থ হন তাহা হইলে আমাদের দুরদৃষ্ট।

আমাদের বিবেচনায় ন্যাশনাল ফণ্ডের উদ্দেশ্য লেখকই 'বিধি-সঙ্গত আন্দোলনের' আদৌ সম্ভাবনা নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

৯। অন্যান্য গ্রহগণ জীবের নিবাস-ভূমি কি?—এই অনন্ত আকাশে আমরা যে সকল গ্রহ দেখিতেছি তাহারা সকলেই এক একটি সূর্য্য, সকলেই এই সূর্য্যের মত গ্রহ ও উপগ্রহ বেষ্টিত। এই প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে এই গ্রহগণ পৃথিবীর জীবের মত জীবের নিবাসভূমি নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন চন্দ্রে জল নাই, চন্দ্রে বায়ু নাই, অতএব চন্দ্র জীবশূন্য। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস ও নেপচুন নিবিড়মেঘ ও বাষ্পাবৃত—ইহা উক্ত গ্রহগণের আভ্যন্তরিক বিষম উত্তাপের ফল এবং সেই উত্তাপে মুহুর্মুহুঃ ঘোর ঘনঘটায় বজ্রবৃষ্টিবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া গ্রহদিগকে বিপ্লবস্ত করিয়া তুলিতেছে। অতএব বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহগণ জীবের নিবাস-ভূমি নহে। বুধ শুক্র ও মঙ্গলের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনেক বিষয়ে পৃথিবীর সঙ্গে সমান। "মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐক্য"। বুধ ও শুক্র সূর্য্যের নিকট বলিয়া অধিক পরিমাণে উত্তাপালোক পাইয়া জীবের বাসের অনুপযোগী। মঙ্গল প্রায় পৃথিবীর সমান উত্তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে। কিন্তু স্বল্পাকর্ষণবশতঃ মঙ্গল গ্রহের বাতাস অতি লঘু। এইজন্য উহাতে পক্ষী ভিন্ন অন্য কোন জীবের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আর দেখান হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর অবস্থা অন্যগ্রহগণের সহিত পরিবর্ত্তন

করিয়া দেখেন যে, সে অবস্থায় পৃথিবীর জীবসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইবে"। কিন্তু পৃথিবীছাড়া সকলগ্রহই প্রকৃত পক্ষে বসতি হীন' এইরূপ নিষ্পত্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। কোন্ অবস্থায় জীব সম্ভব আর কোন্ অবস্থায় জীব অসম্ভব,—এইরূপ একটি সীমা বিজ্ঞান এখনও দিতে পারে নাই। মেরুদেশবর্ত্তী চিরশিলাবৃত খণ্ডে যে মনুষ্য আছে,—এরূপ না জানিলে ইহা মনে করা অসম্ভব হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে অতি গভীর সাগরতলে কোন প্রাণী থাকিতে পারে না। কিন্তু "এখন জানা গিয়াছে যে, সেই অতি গভীর সাগরতলেও জীবের বসতি আছে," এবং তাহারা সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখিতেও পায়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, "কোন স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ অবস্থাভেদে সেই অবস্থার অনুযায়ী জীব উৎপন্ন হইতে পারে"। এবং গ্রহগণ যে, জীবের নিবাস-ভূমি এই কল্পনা সম্ভব। এবং তাহারা যে জ্ঞানবান জীব, তাহাও "ক্রমোন্নতির নিয়মে" দেখান হইয়াছে। সমস্ত জগতেই প্রাণ ও চেতনা অস্ফুটভাবে শক্তির আকারে বিরাজ করিতেছে"। "জড়ও প্রাণময়, জড়ও চেতনাময়; কেবল তাহার চেতনা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সে চেতনা আপনার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া তেমন ফুটিয়া উঠে নাই"। জীবে তাহা হইয়াছে। লেখক এইরূপে প্রবন্ধটিকে শেষ করিয়াছেন,—"অন্য গ্রহগণ জীবের নিবাস-ভূমি বলিয়া যদি একবার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে আর অধিকদূর পর্য্যন্ত টানিতে হইবে, ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিতে পারা যাইবে না"। জীবপূর্ণ লোকে ক্রমোন্নতির নিয়মে "ইতর হইতে ক্রমে উচ্চতর জীবের আবির্ভাব অবশ্যই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই আবির্ভাব কোন গ্রহে ঘটিয়াছে, কোন গ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছে,—এরূপ কল্পনা অসঙ্গত নহে"।

প্রবাহ—আষাঢ়, ১২৯১; ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

১। বসন্তে,—পদ্য। (শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়)।

২। বিবাহে প্রেমজ্ঞান—(শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী)।

৩। ভারতীয় রাজকুল দর্পণ—(শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়)।

৪। ন্যায়-দর্শন (শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি)।

৫। বিদ্যালয়গামী বালকদিগের খাদ্য—(শ্রীযুক্ত সার্জ্জন ধন্মদাস বসু, এল, আর, সি, পি, এল, আর, সি, এস; এডিনবরা)।

৬। সামাজিক আচার ব্যবহার—(ঐ)।

৭। অকাল কুষ্মাণ্ড—(শ্রীযুক্ত মুল্লুকচাঁদ মল্লিনবিস)।

৮। ভারতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক—(শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায়)।

৯। রাঘব,—উপন্যাস। (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র বি, এ, বি, এল)।

২। লেখক প্রবন্ধটী এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন;—"অধুনাতন [illegible]

মধ্যেই এইরূপ একপ্রকার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিবাহ আত্মাকে স্বাধীন হইতে দেয় না, বিবাহ আত্মাকে জড়ীভূত করিয়া ফেলে, বিবাহ যত অনিষ্টের মূল। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা তাদৃশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না, এবং সেই বিশ্বাস হয় না বলিয়াই অদ্য আমার এই 'বিবাহে প্রেমজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা। 'লেখক দেখাইতেছেন যে, জগতের সকল বস্তু—উদ্ভিদ্ ও ইতর জীবজন্তু মিলনসাধনায় দিবারাত্র ব্যস্ত রহিয়াছে। "মিলনই উন্নতির অদ্বিতীয় কারণ"। আবার মনুষ্যের শারীরিক মিলনাপেক্ষা মানসিক মিলনই অধিক প্রার্থনীয়। কারণ, মনের মিলনে মনের পরিধি বাড়িয়া মন প্রশস্ত হইতে থাকে'। এবং 'বিবাহই মানবজাতিগত মনোমিলনের মূল'। ইঁহার মতে, 'বিবাহের পূর্ব্বে নরনারী উভয়কেই জ্ঞানের কঠোর সাধনা করিতে হইবে।' কারণ, তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানদ্বারা উপার্জ্জিত বিচারশক্তি-দ্বারা মনের মত লোক বাছিয়া লইবে। বিবাহই বিশ্বজনীন প্রেমরূপ মহাবৃক্ষের বীজস্বরূপ।

আর্য্যদর্শন—আষাঢ়, ১২৯১, ১০ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

এই সংখ্যার বিষয় :—

১। পাণ্ডব বিজয়। (মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা)।

২। সাধনা (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।—(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৩। সমর শেখর ;—উপন্যাস।

৪। হিন্দু সমাজ-সংস্কার (দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

৫। শত বর্ষের প্রাক্তন বঙ্গ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর),—গৃহের অবস্থা। শ্রীবঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়)।

৬। স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা—(প্রথম প্রস্তাব) (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)।

৭। বাগাঙ্গ-সন্ধ্যা। (শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম)।

৪। হিন্দু সমাজ-সংস্কার। লেখকের মতে,—হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রচলন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। 'রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার নাই—কেবল চীৎকার বা রোদন করিবার অধিকার আছে'। হিন্দু-সমাজ-সৌধ বহুদিন সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 'সমাজ-সংস্কার না করিলে সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়'। কোন 'বিজ্ঞ সম্পাদক' বলিয়াছিলেন যে, 'অধিকাংশ লোকের অভিমত না লইয়া কোন সমাজ-সংস্কার হইতে পারে না'। তাহার উত্তরে ইনি বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষে এরূপ হইতে পারে না। 'বিজ্ঞ সম্পাদক' যে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা এদেশে খাটে না, কারণ, 'আমাদের দেশে কোনকালেই দেশব্যাপী প্রতিনিধি-প্রণালী প্রচলিত ছিল না'। পুরাকালে ঋষিদিগের মত লোকের শিরোধার্য্য করিত। 'সমাজ তাঁহাদিগের মতেই চলিত'। তখন জ্ঞানিগণ জনসাধারণদ্বারা পরিচালিত হইতেন না, জনসাধারণ জ্ঞানিগণদ্বারা পরিচালিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায়ের জন্য সাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের তুষ্টিকর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সংখ্যাবাহুল্যের আধিপত্য সংস্থাপন করিলে শাস্ত্র ও জ্ঞানের অব-

মাননা এবং অজ্ঞানের পূজা করা হয়। 'উত্থানশীল হিন্দুসমাজ যুক্তিমূলক শাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া উঠিবে'। জনসাধারণ বা দেশাচারের অনুবর্ত্তী হইবে না। 'দোষ দেখাইয়া দিলে, যে চটিয়া উঠে তাহার দোষ কখন সংশোধিত হয় না। লেখক দেখাইতেছেন যে, হিন্দুসমাজে আজকাল Might is right—এই যুক্তির প্রাধান্য দৃষ্ট হইতেছে। একজন জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়া যবনান্নভোজন করিয়া জাতিচ্যুত হইলেন আর একজন রুচিপরিবর্ত্তনের জন্য যবনান্ন আহার করিয়া জাতিচ্যুত হইলেন না। কিন্তু 'পাশববলকে এক দিন যুক্তির অধীন হইতেই হইবে।' 'Union is strength'. অতএব হিন্দুসমাজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা আমাদের অপেক্ষা পার্থিব বিষয়ে অনেক গুণে উন্নত, অতএব উন্নতিসাধনের জন্য ইয়ুরোপ ও আমেরিকা গমন করা আমাদের আবশ্যক। পরন্তু এস্থলে যদি জাতিচ্যুত করা হয় তাহা হইলে উন্নতির ব্যাঘাত হইবে। উন্নতিশীল হিন্দুসমাজ স্থিতিশীল অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। তাঁহারা যদি দলবদ্ধ হন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। অতএব তাঁহাদিগকে সমাজভুক্ত করিয়া রাজনৈতিক একতার সূত্রপাত করিতে পারা যায়।

৬। স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য লেখক এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন;—"এই প্রস্তাবে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিলে, তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কি না, শিক্ষার সঙ্গে অধীনতার অর্থাৎ পরাধীনতার সামঞ্জস্য আছে কি না, আমরা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিব"; বিষয়টিকে ছয় অংশে বিভাগ করিয়া প্রথম দুই অংশ—(১) স্বাধীনতা কি? (২) শিক্ষা কি?—এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। যথেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার প্রভেদ এইরূপে দেখাইয়াছেন:—"যে আপনকৃত বা অপরকৃত নিয়ম বা বন্ধন কিছুরই অধীনতা স্বীকার করে না, সে যথেচ্ছাচারী। যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিব কিন্তু আপনকৃত বা অনুমোদিত যুক্তিসিদ্ধ শুভকর নিয়মের অধীন হইয়া চলিব, কাহার অনিষ্ট করিব না, এই ভাবের নাম স্বাধীনতা"। সকল কার্য্য অপরের ইচ্ছাধীন হইয়া করা পরাধীনতা। "জ্ঞানই বল, চরিত্রই বল,—শারীরিকবলসংসাধনই প্রকৃত শিক্ষা'। মনঃসংযম মনের শাসনশিক্ষার মূল। "প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি কখন যথেচ্ছাচারী হয় না"।

ভারতী—আষাঢ়, ১২৯১; অষ্টম ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

১। পরমাণবিক সিদ্ধান্ত। (শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়)।

২। সৌন্দর্য্য ও প্রেম। (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

৩। ধর্ম্মযুদ্ধ। (শ্রীরামদাস সেন)।

৪। বিদ্যাশিক্ষা ও ভারতের সাধারণ ভাষা)।

৫। কারে ডাক [illegible]

৬। ভাউ সাহেবের বখর।

৭। চাকতার জয়। (শ্রীবিজয়লাল দত্ত)।

৮। লীলা—উপন্যাস। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

৪। বিদ্যাশিক্ষা ও ভাবতের সাধারণ ভাষা।—লেখক এই প্রবন্ধে দেখাইযাছেন যে, আমাদেব দেশে উৎপন্ন বস্তুব লাভ আমবা ভোগ কবিতে পাই না। বসাযন, পদার্থ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাব আলোচনা আমাদেব দেশে নাই। লেখক দেশেব মধ্যে একটি সাধারণ ভাষাব অভাব দেখাইযাছেন, আব বলিযাছেন যে, এই অভাব সংস্কৃত ভাষাব পুনরুদ্ধাবে মোচন হইতে পাবে। আবাব বলিযাছেন "দেশেব উন্নতিব জন্য ইংবাজীভাষাব চর্চ্চাও প্রযোজন'।

নবজীবন। প্রথম খণ্ড, ১ ম সংখ্যা; শ্রাবণ, ১২৯১।

এ সংখ্যায 'সূচনা' বাদে সর্ব্বসমেত ৮টী প্রবন্ধ আছে; ছযটী গদ্য ও দুইটী পদ্য। পদ্য দুইটীব নাম "নবজীবনের গান" ও 'মদনপূজা'। 'গান'টী, বোধ হয, হেমবাবুব লেখা। গদ্য কয়েকটীর মধ্যে 'সমাজ-শবীর' নামক প্রবন্ধ হার্বার্ট্ স্পেন্সাবেব সমাজতত্ত্ব-সংক্রান্ত অভিনব মতেব ছাযা অবলম্বনে লিখিত; 'সিংহল-যাত্রা'—শ্রীযুক্ততারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাযেব ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক রোজনামচা। অবশিষ্ট ৪টী প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" বাদে অন্য তিনটী প্রবন্ধের নাম, "সর্ষপ মাহাত্ম্য," "কুঞ্জলতাব," ও "ভানুসিংহের জীবনী"। এই তিনটী প্রবন্ধ [illegible] এবং রহস্য-পরিব্যঞ্জক। সংক্ষেপতঃ এ সংখ্যায় যে কযটী প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে বঙ্কিমবাবুর "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসাই" কিছু সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য। এই জন্য আমবা তাহারই সারোদ্ধার কবিয়া সাধারণ পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

বঙ্কিমবাবু, শিষ্যেব প্রশ্ন গুরুর উত্তর দ্বারা—কথোপকথনচ্ছলে,—ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম্মের লক্ষণ, উদ্দেশ্য, প্রযোজনীয়তা ও পবিণাম কি—ইত্যাদি নিগূঢ় বিসয়েব সবল ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা কবিতে প্রযাস পাইযাছেন ও তজ্জন্য হিন্দু-শাস্ত্রকার আর্য্য-ঋষি ও পাশ্চত্য জ্ঞানভাণ্ডারাধিকাবী পণ্ডিতমণ্ডলী উভয পক্ষেরই যুক্তি, তর্ক ও মতামত সংগ্রহ কবিযা তাহার বিশেষ বিচার করিয়াছেন। গুরুব নিকট শিষ্য প্রশ্ন কবিলেন, "ধর্ম্মে কিছু কি প্রযোজন আছে?' এই প্রশ্ন হইতে নানা কথা উঠিল। ইহকাল, পবকাল, ধর্ম্ম ও নীতি; ধর্ম্মের শব্দার্থ, ভাবার্থ, বহ্বর্থ, নানারূপ ইংরাজী প্রতিশব্দ, ইত্যাদি। Religion, morality ও politics এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোধক ইংরাজী শব্দেব প্রত্যেকটীকেই বাঙ্গালায় ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা হয়। তার পব রিলিজন বা নীতিব অনুমোদিত যে কার্য্য তাহাকেও ধর্ম্মবলে, যথা দান। পরন্তু 'ধর্ম্ম'শব্দে গুণ বুঝায়; যথা, চুম্বকেব ধর্ম্ম—লৌহাকর্ষণ। অপিচ 'ধর্ম্ম' শব্দ কখন কখন আচার ও ব্যবহার অর্থে প্রযুক্ত হয়। লেখক বলেন, ধর্ম্মের 'এই ছযটী অর্থ লইয়া এদেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে।' 'এই গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা ৩ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক'।

এই গোলযোগই, লেখকের মতে, হিন্দু-ধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি লোকের আধুনিক অনাস্থার অন্যতম গুরুতর কারণ।

তবে ধর্ম্ম কি? লেখক বলেন, পরলোক বা দেবদেবীতে বিশ্বাস,—ঈশ্বর বা লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস, ইহার কাহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কেন না, ঐ সকল বিশ্বাস না থাকিলেও ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্ভব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক কয়েকটী ধর্ম্মের নাম করিয়াছেন, যথা,—প্রাচীন য়ীহুদধর্ম্ম, ঈসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং Religion of Humanity প্রথমোক্ত ধর্ম্মে পারলৌকিক বিশ্বাস ছিল না, শেষোক্ত দুইটী ধর্ম্ম নিরীশ্বর এবং ঈস্‌লাম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দেবদেবী নাই, অথচ ইহার প্রত্যেকেই এক একটী ধর্ম্ম। নিরীশ্বর ধর্ম্মও 'পরম রমণীয়'।

অতঃপর শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তবে আপনিই বলুন, ধর্ম্ম কাহাকে বলে"

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" মীমাংসা-দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তরদানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র-গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি"।

অতঃপর লেখক, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় কোন কোন প্রধান পণ্ডিত কর্ত্তৃক ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতি যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। ভারতীয় শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মীমাংসাকার, লৌগাক্ষি ভাস্কর এবং তৎপরে শ্রুতি ও ভগবদ্গীতার মত কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন; সর্ব্বোপরি গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য সংস্থাপনার্থে সচেষ্টিত হইয়াছেন। মহাভারতীয় বনপর্ব্ব হইতে 'কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের' দুই চারিটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এই,—"প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিগের হিংসানিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্মনাম নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম।"

পুনশ্চ,—'যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়।" অতএব সত্যই ধর্ম্ম।

এস্থলে শিষ্য তর্ক উঠাইলেন যে, উপরে যাহা বলা হইল, তাহা ত নীতি বা Morality-রই ব্যাখ্যা। "রিলিজনের ব্যাখ্যা কই"?

গুরু শিষ্যকে বুঝাইলেন, যে, "রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, তাহার স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহাদের সমগ্র জীবন রিলিজন বা ধর্ম্মময় ছিল। ধর্ম্ম হইতে তাঁহাদের জীবনের কোন কার্য্যই বিচ্ছিন্ন ছিল না।

অনন্তর লেখক ধর্ম্ম ও রিলিজন উভয় শব্দের ধাত্বর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্ম= ধৃ+মন (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই অর্থে লেখক ধর্ম্মকে Religion শব্দের "প্রকৃত প্রতিশব্দ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মের Definition বা প্রকৃতিনির্ণয়-সম্বন্ধে লেখক আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কাণ্ট, ফিক্তে. শ্লিয়ের, হিগেল, মক্ষমূলর, টেলর, মৌসুক, জন মিল, সিলি, ও কোমতের মত অল্লাধিক পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মিল ও সিলির মতকে আংশিক ধর্ম্মনির্ণায়ক বলিয়া কোমতের মতকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

সিলির মতে, মনুষ্য অন্তঃকরণের Habitual and permanent admirationই ধর্ম্মের মৌলিকভাব এবং ঐ ভাবেরই ফল 'মিলের Strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence সিলিকর্ত্তৃক বিনির্ণীত মানসিক ভাবকে লেখক 'ভক্তি' বলেন ও মিলের মত উহার সহিত একত্র করিয়া উহাকে ধর্ম্মের 'একটী অঙ্গ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তার পর কোমতের মত। এই মতে Religion consists in regulating one's individual nature and forms the rallying point for all the separate individuals. লেখক বলেন :—"যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম"। ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও চৈতন্য—ইঁহারাও উহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারেন নাই। যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

শিষ্য। তবে সেই ভগবদ্গীতায় যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, আমাকে তাহাই বুঝাইয়া দিন।

কেননা তোমাকে যাহা বুঝাইতে হইতেছে তাহা 'বিলিজন। ভগবদ্গীতার বিলিজন সকল বিলিজনের শ্রেষ্ঠ'।

শিষ্য বলিলেন, এতক্ষণ 'জৈমিনি হইতে কোমৎ পর্য্যন্ত যাবতীয় পণ্ডিতের মত শুনিয়া তাহার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অতএব গুরু নিজেই বিলিজন কি বুঝাইয়া দিন'।

অতঃপর লেখক পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহার অনেক কথার সামঞ্জস্য করিয়া ধর্ম্মের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে "প্রকৃত সুখের যে উপায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আর সকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ। কিন্তু সুখ কাহাকে বলে? সমগ্র মানব প্রকৃতির—'শারীরিক, মানসিকও আন্তরিক' বৃত্তিসমষ্টির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ। এই সুখ প্রাপ্তির উপায় ধর্ম্ম'।

Doctrine বা creed, worship বা Rites ও morality এই তিনভাগে ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়া লেখক উহার প্রত্যেকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

(১) সুখের উপায়ই ধর্ম্ম। সুখে জীবন-নির্ব্বাহ অন্তর্জ্জগত ও বহির্জগতের অধীন। অতএব অন্তর্জ্জগতেরও বহির্জগতের প্রকৃতি আমাদের জানা চাই। যেখানে জানিতে না পারি, সেখানে একটা তত্ত্ব মনে স্থির করিয়া লই, যথা, এই জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট ও ঈশ্বর-নিয়ত, এবং ইহলোকের ফল, পরলোকে বা জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয়। জগৎ-সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। ইহাই ধর্ম্মের মূল,—Creed বা Doctrine. বৈজ্ঞানিক সত্যও ইহার অন্তর্গত। ইহা ধর্ম্মের প্রথম উপাদান।

তাহার মধ্যে উপাস্য পদার্থ পাওয়া যায়। মিলের Ideal object of the highest excellence—তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে নিহিত। উহাই উপাস্য। উহা কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেবদেবী, কোথাও গাছপাথর, কোথাও Humanity। তার পর সিলির সেই habitual and pemanent admiration বা ভক্তিকেই উপাসনা, worship বা Rites বলি। ইহা ধর্ম্মের দ্বিতীয় উপাদান।

(৩) আমাদিগের বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন এবং চরিতার্থতার অর্থাৎ জীবন-নির্ব্বাহের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে যে নিয়মে উহার অনুশীলন ও তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল ঐ জ্ঞান হইতে অনুমিত করিয়া লই। সেই নিয়ম নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র বা morality. ইহা ধর্ম্মের তৃতীয় উপাদান।

উপরোক্ত তিন প্রকার উপাদানের সমবায়ই ধর্ম্ম। সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ইহার দ্বারা নিয়ত এবং সমগ্র সমাজের ইহাই কেন্দ্রীভূত। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদিগের নীত্যাত্মিকা, জ্ঞানাত্মিকা ও কর্ম্মাত্মিকা ধর্ম্মব্যাখ্যা ইহারই অন্তর্গত। এই নিখিল ধর্ম্মে শারীরিক ধর্ম্মও নিহিত। শারীরিক ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে ভারতবা[illegible]দুর্ব্বল, পরাধীন ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, লেখকের মতে, কোন ধর্ম্মই ঈশ্বরপ্র[illegible] করে অভ্রান্ত ঋষিপ্রণীত নয়। সকল ধ[illegible]ত-অল্পাধিক পরিমাণে সত্য ও মিথ্যা আছে। যে ধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণীয়। লেখকের মতে, হিন্দুধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, অতএব উহা সর্ব্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়।

গুরু শিষ্যকে ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

১। মধ্যে "ইণ্ডিয়ান মিরার" অপরাধের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষীয় সাধারণ-প্রজাবর্গের অবস্থা অধিকতর মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য 'মাননীয় ভারতবন্ধু' পায়ইওনিয়র-সংবাদপত্র সমগ্র বাঙ্গালিজাতিকে "ভূত-ভবিষ্যৎ" আর কিছু বাকি রাখেন নাই। পায়ইওনিয়র বলেন যে, ইংরাজদিগের আগমনে ভারতবর্ষের উদ্ধার হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় লোকদিগেরও জীবন্মুক্তি হইয়াছে; ইংরাজের রাজত্ব এবং শাসন-প্রণালী উৎকৃষ্ট এবং অতুলনীয়; বাঙ্গালি-জাতি নাকি অতি অকৃতজ্ঞ এবং অন্যায়, তাহাতেই তাহারা "এহেন" রাজত্বের দোষ দর্শাইয়া থাকে। পায়ইওনিয়র [illegible]

উঠিয়াছি, সুতরাং সে জন্য আমাদের কোন আক্ষেপ নাই। তবে আসল কথাটা সত্য কি না, তাহাই সকলের বিবেচনা করা উচিত। ইংরাজশাসনে আমাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়াছে কি না—এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে ভারতবাসিমাত্রেই ইণ্ডিয়ানমিরার উক্তি অনুমোদন করিবেন। এবং আমাদিগের মধ্যেও অনেকে এরূপ লোক আছেন, যে, যাঁহারা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র সন্দিহান হইবেন। কেবলমাত্র "অন্ন বস্ত্রের" কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে বিচার করা যায়, তাহা হইলে ইহাই পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অবস্থা অনেক মন্দ হইয়াছে। কেন না, সেই অন্নবস্ত্রের জন্য আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষে যেরূপ হাহাকার উঠিয়াছে, এমন পূর্ব্বে আর কখনই উঠে নাই, এমন কি, যে মুসলমান রাজত্বকে ইংরাজেরা এত মন্দ বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই মুসলমানরাজত্বসময়েও এরূপ কখন ঘটে নাই। তখন বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা ছিল না, কিম্বা বিজ্ঞানপ্রসূত অশেষবিধ সুখস্বচ্ছন্দতা,—যাহা আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আনীত হইয়াছে, তাহাও—ছিল না। রেলওয়ে ছিল না, টেলিগ্রাফ ছিল না, বাষ্পীয় যন্ত্র ছিল না, কিন্তু অপর পক্ষে লোকের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল,—সত্য বল, আর অসত্যই বল, তখন দুই বেলা সকলে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিতে পাইত। ইংরাজেরা তাঁহাদের সভ্যতা অনুযায়ী অনেক সুখস্বচ্ছন্দতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পেটের জ্বালাটা নাকি বড়ই জ্বালা, তাই, [illegible] ভারতবাসীরা তাঁহাদের [illegible] উপর দোষারোপ করিতে প্রস্তুত হয়। রাস্তা ঘাট, রেলওয়েটেলিগ্রাফ, স্কুলকলেজ ইত্যাদি অশেষবিধ স্বজাতীয় কীর্ত্তি দেখিয়া পাইওনিয়রের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই কেহ একটি কথা বলিলে তাঁহার সহ্য হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া আসল যে কথা, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। স্বজাতীয়ের প্রশংসা শুনিলেই পাইওনিয়র সুখী হইবেন, কিন্তু দোষ প্রদর্শিত হইলেই রোষকষায়িতলোচনে বাক্যপীযূষ বর্ষণ করিতে থাকিবেন।—এ বড় ভয়ানক রোগ। এ রোগের ঔষধ কোথায় পাইওনিয়র বলেন, আজকাল ভারতবর্ষমধ্যে কেবল বাঙ্গালীরাই অনেক প্রকার কথার উত্থাপন করে, সুতরাং বাঙ্গালীরা অতি "পাজী" এবং অকৃতজ্ঞ। কিন্তু বাঙ্গালীরা যে বুঝে বলিয়াই বলে, পাইওনিয়র একথা বুঝিতে পারেন না। এখন কেবল বাঙ্গালীরা বলিতেছে; কিন্তু পাইওনিয়রের বুঝা উচিত যে, আর দিন কতক পরে ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীরাই এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিবে। তখন যে "ভায়ার" রোগের কি ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা ঈশ্বরই অবগত আছেন।

২। ইংরাজদিগের অসীম গতিশীলতা, দুর্দ্দমনীয় আত্মম্ভরিতা, এবং অসাধারণ স্বার্থপরতাতেই আমাদের উপস্থিত কষ্ট আবির্ভূত হইয়াছে। ইংরাজ এক ধাতুর লোক, ভারতবাসীরা আর এক ধাতুর লোক। একথা ইংরাজ কখন বুঝেন নাই, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বার্থান্ধ হইয়া কখন বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। আমাদের এ দেশটা যে একটা দেশ ছিল কিম্বা আমাদের

সমাজটা যে একটা সমাজ ছিল, তাহা ইংরাজেরা কখন বিবেচনা করেন নাই। এখানে আসিয়াই, যাহা ছিল সে সমস্তই মন্দ এবং অপদার্থ,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তাহাতে আপনাদিগের দেশের এবং সমাজের প্রথা অনুযায়ী অসংখ্য অসংখ্য পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যও অত্যন্ত প্রবল ছিল, সুতরাং পরিবর্ত্তন করিবার সময় আর কোন দিকে তাঁহারা তাকাইলেন না। যাহা ছিল সে সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলেন,এবং সহস্র সহস্র বৎসরের প্রচলিত শৃঙ্খলা ভগ্ন করিয়া দেশবাসিদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং অনভ্যস্ত একটী অভিনব শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই শৃঙ্খলা অচিরে বাহিকে অনেকগুলি সুন্দর সুফল প্রসব করিল, সমস্ত দেশ দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলা এবং উপজেলায় বিভক্ত হইল, এক একটী জেলায় এক এক জন পৃথকশাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; অগণ্য বিচারালয় স্থাপিত হইল, এক একটী বিচারালয়ে এক একটী বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন, বিচারকার্য্য সুচারুরূপে এবং সুনিয়মে সম্পাদিত হইবার জন্য শত সহস্র নূতন নূতন আইন সৃষ্ট হইল, অপর দিকে সহস্র সহস্র ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাসাদসমন্বিত সহস্র সহস্র বড় বড় সহর আবির্ভূত হইল, স্কুলকলেজ হইল, চিকিৎসালয় হইল, রাস্তাঘাট হইল, রেল-ওয়েটেলিগ্রাফ হইল, দেখিতে দেখিতে দেশ এক নূতন আকার ধারণ করিল। পুরাতন বন্দোবস্ত আর কিছুই থাকিল না; ইংরাজেরা স্বয়ং তাহাকে ত ঘৃণা করিয়াই থাকেন; এমন কি, দেশের অধিবাসীরাও তাঁহাদের উপদেশ এবং দৃষ্টান্তক্রমে তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। কিন্তু, এদিকে ভিতরে ভিতরে এ সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। ইংরাজেরা যাহা কিছু করিলেন, তাহাতে অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন; রাজত্বের যাহা কিছু করিতে হইবে, সে সমস্তই তাঁহাদের স্বজাতীয়েরা করিবেন, সুতরাং লক্ষ লক্ষ ইংরাজ ভারতবর্ষে রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন দুই শত হইতে বিশ সহস্র পর্য্যন্ত। তাহার পর এত বড় দেশটাকে আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য স্বদেশীয় সৈন্যের প্রয়োজন, সেই সৈন্য রক্ষা করিতে বাৎসরিক দশ কোটী টাকা ব্যয়। এই উভয়বিধ ব্যয়ের সমষ্টি অন্যূন ৬০।৭০ কোটী টাকা। এই টাকাটি ভারতবর্ষকে দিতে হইবে। পূর্ব্বে এই উভয়বিধ কার্য্যের জন্য বাৎসরিক ১০ কোটী টাকার প্রয়োজন হইত কি না সন্দেহ, কিন্তু এক্ষণে তাহা একেবারে চতুর্গুণ হইয়া গেল। পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করুন, যে, পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতবাসিদিগের আয়ের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে কি? যে, তাহারা অনায়াসে এই চতুর্গুণ ব্যয়ভার বহন করিতে পারে? অনেকে বলিবেন, যে, কেন? পূর্ব্বে কত জমী অনাবাদী হইয়া পতিত ছিল, এক্ষণে তাহা আবাদ হইতেছে, সুতরাং আমাদের আয়ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, একদিকে আবাদী জমীর পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, অপর দিকে দেশের লোক-সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং অধিক আবাদের জন্য আমাদের আয় কিছুতেই অধিক হয় নাই। কিন্তু তথাপি আমরা

দিগকেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ভয়ানক ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে। দেশী হিসাবে চলিলে এই খরচের চতুর্থাংশও লাগিত কি না সন্দেহ; কিন্তু ইংরাজদিগের আত্মম্ভরিতা একদিকে যেরূপ প্রবল অপর দিকে তাঁহাদিগের স্বার্থপরতাও অসীম। ভারতবর্ষ রসাতলে যাউক ক্ষতি নাই, লোকেরা অন্নকষ্টে হাহাকার করিতে থাকুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু মাসিক সহস্র সহস্র বেতন দিয়া স্বজাতীয় এবং স্বদেশীয় ভাইবন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতেই হইবে! একথা উঠাইলে, ইহাই বলা হয় যে, যে প্রণালীতে তাঁহারা রাজকার্য্য করিয়া থাকেন, ভারতবাসীরা কিছুতেই সে প্রণালী চালাইতে সক্ষম নহে। শাসিত হইবে—ভারতবাসীরা, অথচ ভারতবাসীরাই সে কার্য্য নিজে করিতে অক্ষম। এই অত্যাশ্চর্য্য কথায় কি কিছু অর্থ আছে? ভারতবাসীরা অশিক্ষিত ছিল—ইংরাজী জানিত না, পূর্ব্বে এই এক "ওজর" ছিল, এখন তাহাও অনেকাংশে গিয়াছে, এবং হাতে কলমে কার্য্য করিয়াও আজকাল ভারতবাসীরা সহস্রে সহস্রে আপনাদিগের কার্য্যদক্ষতা সপ্রমাণিত করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার উপায় নাই; ইংরাজদিগের উদারতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ তাঁহাদের অনুদারতাই বর্দ্ধিত হইতেছে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বয়স কমাইয়া দেওয়া তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৩। তাহার পর স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়দিগকে রাজকর্ম্মচারিস্বরূপ নিযুক্ত করতঃ প্রতিপালন করিয়া কি ইংরাজেরা ক্ষান্ত আছেন? দেশের ব্যবসায়বাণিজ্য যাহা কিছু,—যাহা অবলম্বন করিয়াও অনেক লোক প্রাণধারণ করিতে পারে এবং যাহা তাহাদের হস্তগত হইলেও দেশের অনেকটা ধন দেশেই থাকিতে পারে,—তাহাও তাঁহাদের ভাইবন্ধুকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ব্যবসায়বাণিজ্য—স্বাধীন কার্য্য, তোমার টাকা থাকে, ইচ্ছা থাকে, উৎসাহ থাকে, তুমিও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পার, ইংরাজ কিছু তাহাতে তোমার হস্তরোধ করিবেন না, তুমি তাহা করিতে পারিতেছ না, সুতরাং ইংলণ্ডের লোকেরা আসিয়া তাহা করিতেছে। অবস্থাটা যদি ঠিক এইরূপ হইত, তাহা হইলে অবশ্য ইংরাজদিগের কোন প্রকার দোষ দিতে আমাদের অধিকার থাকিত না। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। ইংরাজজাতি আমাদিগের অপেক্ষা শতসহস্রগুণে উৎসাহী এবং ব্যবসায়বাণিজ্যপ্রিয় তাহা স্বীকার করি, এবং সেইজন্য এ সমস্ত কার্য্য যে তাঁহাদেরই উপযুক্ত তাহাও মানি, কিন্তু কথা এই যে, একে তাঁহারা এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত, তাহাতে যদি স্বয়ং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা দাঁড়াই কোথা? রাজকার্য্য চালাইবার জন্য যত প্রকার জিনিস আবশ্যক—সামান্য "পিন্" হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের কল পর্য্যন্ত সমস্তই বিলাত হইতে আমদানি হইবে। বিলাত হইতে যে কিছু জিনিস আসুক না কেন, তাহার শুল্ক লওয়া হইবে না; ভারতবাসিরা কোন জিনিস পাঠাইতে গেলেই তাহার উপর শুল্কের আইন জারী হইবে! এরূপ ব্যবহারকে অবিচার এবং স্বার্থপরতা ভিন্ন

আর কি বলা যাইতে পারে? বিলাতি জিনিস হইলেই 'স্বাধীন বাণিজ্যের' দোহাই, আর তাহা না হইলে, কিছু নহে? স্বাধীন বাণিজ্য যে ভাল জিনিস আমরা স্বীকার করিলাম, এবং এবিষয়ে পৃথিবীর অপরাপর জাতির অপেক্ষা ইংরাজেরাই কিছু বেশী অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা যখন এরূপ বিপন্ন, ব্যবসায়বাণিজ্য যখন তথায় একেবারেই নাই, তথাকার লোকেরা কেবলমাত্র যখন এদার্য্য অন্নে অল্পে অস্তু করিতে শিখিতেছে, এবং তাহাদের ধন, মান, মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই যখন তাহা দের হস্তে অর্পিত; তখন তাহাদের মুখের দিকে একটু তাকাইয়া কার্য্য করা কি উচিত নহে? তাহাদের স্ফুটনোন্মুখ বাণিজ্যপ্রবৃত্তিকে কি একটু উৎসাহ প্রদান করা উচিত নহে? কিন্তু আমাদের অদৃষ্টদোষে ইংরাজ ইহাতে সম্মত নহেন। ভারতবর্ষের অবস্থা যাহা হউক, ভারতবাসীরা তাহাদের প্রদত্ত নূতন জ্ঞান এবং শিক্ষাপ্রভাবে ক্রমশঃ উন্নীত হউক বা না হউক,—সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের স্বদেশের এবং স্বদেশীয়দিগের যাহাতে পূর্ণমাত্রায় স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহাই করিতে হইবে। ইহাতে কি ভারতবর্ষে টাকা থাকিতে পারে? না, এরূপ প্রক্রিয়া ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিলে ভারতবাসীরা অন্নবস্ত্রসম্বন্ধে সচ্ছলাবস্থ হইতে পারে? ভরসা করি, বিজ্ঞ পাইওনিয়র এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন।

৪। ইংরাজ-রাজত্বে ভারতবর্ষের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়াছে কি না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটী প্রধান কারণের আমরা আলোচনা করিলাম। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণ আছে,—যাহাতে শুধু যে, অর্থসম্বন্ধে আমাদের অবনতি হইয়াছে এরূপ নহে, আমাদের নৈতিক অবনতিও যথেষ্ট হইয়াছে,—কিন্তু প্রস্তাববাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে বলা হইল না। তবে ঘূর্ণিত মস্তক পাইওনিয়রকে মোটের উপর একটা শেষ কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

সে কথাটী এই। যদিও ইংরাজরাজত্বে অনেক বিষয়ে আমাদের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি সহস্রকষ্টস্বত্বেও প্রণের সহিত আমরা এই রাজত্ব ভালবাসি, এবং ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকি যে, যেন এখনও কিছুকাল এই রাজত্ব ভারতবর্ষে স্থায়ী হয়। আমাদের এরূপ ইচ্ছার কারণ এই যে, হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র বৎসর হইতে উচ্চতম সভ্যতা উপভোগ করিয়া প্রকৃতিরই নিয়মানুসারে অল্পে অল্পে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পরিবর্ত্তী অনেক নূতন জাতি জগৎমধ্যে আবির্ভূত হইয়া এবং অশেষবিধ লীলাখেলা করিয়া আজকাল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কে জানি, হিন্দু জাতির আভ্যন্তরিক বিধিবন্দোবস্তের মধ্যে কি এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে যে, তাহার বলে সে জাতি জগৎমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন হইয়াও আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, শুধু বর্ত্তমান নাই, আজ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত পুরাতন বন্দোবস্ত অক্ষত রহিয়াছে। কিন্তু এই অতুলনীয় হিন্দুজাতি কালক্রমে ভোগাতিশয্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল; মধ্যে মুসলমানেরা আসিয়া অনেক 'নাড়া চাড়া' দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সে নিদ্রা সম্যক্ ভঙ্গ হয় নাই। এক্ষণে আশ্চর্য্যের বিষয়—সুখের বিষয়

আহ্লাদের বিষয় এই যে, শতাধিক বৎসর মাত্র ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রভাবে সেই কালনিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। যাহার চক্ষু আছে, সে দেখিতেছে, যাহার চক্ষু নাই, সে একথা অবহেলা করুক। কিন্তু ইংরাজ যে কেবলমাত্র ইচ্ছা করিয়া বিদ্যা দান করিয়া কিম্বা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে এই কার্য্য করিয়াছেন তাহা নহে। কতক সে কারণে হইলেও হইতে পারে, পরন্তু তাহার অবিচার, স্বার্থপরতা, এবং অর্থশোষণলালসাই তাহার মূলীভূতকারণ। ইংরাজ যত এই প্রবৃত্তি নিচয় চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ততই ভারতবাসিদিগের উপর 'চাপ' পড়িতেছে, এবং ততই তাহারা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সকল দিক দেখিতেছে, এবং বুঝিতেছে। এ উপকার বড় সহজ উপকার নহে, এবং ইহার জন্য আমরা ইংরাজজাতিকে মনঃপ্রাণ খুলিয়া শতসহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি। ইংরাজ অত্যাচার করিয়া ভারতসন্তানের একপক্ষে উপকার করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও, ভারতীয় প্রকৃতি স্বভাবতই রাজভক্ত,—ইংরাজরাজ্যের অমঙ্গল কামনা করে না, অমঙ্গল কামনা করেনা বলিয়াই ইংরাজশাসনগত অমিতাচারের প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদে যাঁহারা ক্রোধান্বিত হন, তাঁহারা নিতান্তই মূর্খ।

হঃ মঃ।

নানাকথা।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারসম্পাদিত নূতন মাসিক পত্রের 'সারসংগ্রহ' যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। এই পত্রের বিজ্ঞাপিত 'নূতন ধরণ, নূতন লিখন ও পদ্ধতি প্রকরণ' এখনও কিছু প্রকাশ পায় নাই; বোধ হয় ক্রমে পাইবে। প্রথম সংখ্যাতেই কয়েক জন বিখ্যাতনামা ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কিন্তু, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, প্রবন্ধলেখকদিগের যেরূপ উচ্চ ও উজ্জ্বল নাম, রচনা তদনুরূপ হয় নাই। [illegible] সংখ্যার সমস্ত প্রবন্ধই 'পাঁচ্‌পাঁচী'শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়; কোন কোনটী তদপেক্ষাও অধম। 'কুঞ্জ সরকার' ও সর্ষপমাহাত্ম্য'সদৃশী রচনা 'নবজীবনের' ন্যায় উচ্চস্থান-প্রয়াসী পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত না হওয়াই ভাল। 'উচ্চ-অঙ্গ'-ওয়ালারা 'চুট্‌কিসুর' ধরিয়াও যদি 'তাল কাটেন', তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের প্লিবিয়ান'সম্প্রদায়ের ত আর দাঁড়াইবারও স্থান থাকিবে না। যাহা হউক পত্রখানির সবে এই প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে; এখনই উহার বিচার করিতে বসা অত্যন্ত

অন্যায় ও নিষ্ঠুরতাপরিব্যঞ্জক। সম্পাদক বিজ্ঞ, প্রবীণ, লিপিদক্ষ এবং সুরসিক,—সম্পাদকতাকার্য্যে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার অধিকাংশই তাঁহাতে আছে। এক্ষণে তিনি লেখকগণের নামমাহাত্ম্যে একান্ত বিমোহিত না হইয়া লিখিত প্রবন্ধের প্রতি একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেই কাগজখানি উচ্চ স্থানলাভে সমর্থ হইবে।

সরকারমহাশয়ের নব পত্রের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে উহার 'নামকরণ'সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম। নামটীর ভাবার্থ সম্যকরূপে বুঝিতে না পারিয়াই অবশ্য সেই কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলাম। যখন লিখিয়াছিলাম তখনও কিন্তু এরূপ আশা ছিল যে, সুদক্ষ সম্পাদক 'পত্রসূচনায়' বঙ্গের আকস্মিক (?) নবযুগ' ও 'নব-জীবনের' প্রকৃত কারণ পরম্পরার ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। সরকারমহাশয় অবশ্য সে পক্ষে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আমাদিগের স্থূলদৃষ্টি বা স্থূলবুদ্ধিতে 'বিজ্ঞাপনে' যাহা বুঝিয়াছিলাম সূচনাপাঠে তদপেক্ষা অধিক কিছুই বুঝিতে সক্ষম হই নাই। 'নবজীবনের' 'সূচনার' প্রথম ছত্রেই লেখা হইয়াছে,—"যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা; জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না" এ কথাকয়টা কি সম্পূর্ণ সত্য? যাহা সকলে বুঝে তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিড়ম্বনা হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার প্রয়োজনাভাব? প্রতিদিন মনুষ্য মরিতেছে এবং প্রত্যেক মনুষ্যকেই নিশ্চয় মরিতে হইবে, ইহা অবশ্য সকলেই জানে—সকলেই বুঝে, তথাচ সময়ে সময়ে কথাটা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় কেন? বঙ্গ-সাহিত্যে সম্প্রতি একখানা 'উচ্চ অঙ্গের' সাময়িকপত্রের আবশ্যকতার বিষয় সম্পাদক না বুঝাইলে বিশেষ ক্ষতি না হইলে, না হইতেও পারে, কিন্তু যাহা লোকে বুঝে, তাহা বুঝাইবার একেবারেই প্রয়োজনাভাব কিরূপে সম্ভবে? এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে ত সংসারে অধিকাংশ কথাই না বলিলে চলে। যাহা লোকে বুঝে, তাহা বুঝান যদি যথার্থই অনাবশ্যক হয়, তবে বাঙ্গালীর নবজীবনপ্রাপ্তির বিষয়টা বুঝাইবার জন্য সম্পাদক এত চেষ্টা করিয়াছেন কেন? তিনি নিজেই না বলিতেছেন—"নূতন দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে, বঙ্গবাসী নূতন অভাব অনুভব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত"?—"বাঙ্গালির হৃৎক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত"? বাঙ্গালীর হৃৎক্ষেত্রে যদি যথার্থই যুগান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে,—ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে, যে সে তাহা জানিয়াছে ও বুঝিয়াছে। সে যাহা জানিয়াছে বুঝিয়াছে তাহা তাহাকে জানাইতে ও বুঝাইতে যাওয়া অবশ্য 'ঘোরতর বিড়ম্বনা'। সম্পাদক 'জানিয়া শুনিয়া' এই বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? 'বাঙ্গালী আজকাল নব-উৎসাহে উৎসাহিত' সম্পাদক নিজে সেই উৎসাহের উৎসবে যোগ দিতে ব্যস্ত, তবে আবার কষ্ট করিয়া বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর 'নবজীবন'-সমাগমের বিষয় বুঝাইয়াছেন কেন? সে কি বুঝে নাই? যে ব্যক্তি দ্রব্যটা পাইল; সে তাহা জানিল না—বুঝিল না,—অন্যে বুঝাইয়া দিবে, তবে বুঝিবে? আমার মাছটী

উৎসব হইতেছে আমি তাহা জানি না, আপনি সেই উৎসবে যোগ দিতে আসিয়া, উৎসব হওয়ার কথা আমাকে জানাইবেন,—তবে জানিব? ইহা অবশ্য নূতন ন্যায়শাস্ত্র। কিন্তু তা যাক্। বাঙ্গালী হঠাৎ 'নবজীবন' পাইল বা পাইবার জন্য প্রস্তুত হইল কি রূপে? সম্পাদক এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ছন্দোবন্ধ ও রচনা-চাতুর্য্য বাদ দিয়া, ভাষা ও ভাবতরঙ্গের তাত্ত্বিক কুয়াসা ভেদ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা এই,—গতাসু "বঙ্গদর্শন"পত্র বঙ্গদেশের আধুনিক 'নবজীবন ও নব উৎসাহের' একমাত্র আদি ও মূল কারণ। 'পুরাণে, ইতিহাসে, দেবতত্ত্বে, সমজতত্ত্বে, কবিত্বে সাহিত্যে,—সর্ব্বত্রে—যেখানে যত স্তরের নীচে স্তর আছে, আজি বার বৎসর ধরিয়া, 'বঙ্গদর্শন' ক্রমাগত সেই সকল স্তর ভেদ করিতে করিতে, বাঙ্গালীকে এমন এক নিম্নতম 'স্তরে' নামাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছে যে, 'বঙ্গবাসী' সে স্তরে পৌঁছিয়াই (একটু আগেও নয় একটু পাছেও নয়) 'আধার আধেয়' ও 'কুঠস্থ চৈতন্য' জ্ঞানলাভের জন্য নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। আজ সেই ব্যগ্রতাজনিত 'নবযুগ ও নবজীবন' উপস্থিত। সমালোচ্য মাসিকপত্র এই যুগের ও এই জীবনের 'নূতন পঞ্জিকা'। সরকার মহাশয়ের এই কৈফিয়তে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা বৃথা। গোঁড়ামী বলিয়া একটা জিনিস আছে—সেটা ধর্ম্মপ্রচারের একটা অঙ্গ। সরকারমহাশয় সম্প্রতি ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যে ব্রতী; অতএব সে জিনিসটা যদি তাঁহাতে অর্শিয়া থাকে সে প্রশংসারই কথা, নিন্দার নহে। তবে আমাদের একটা 'তত্ত্ব' জিজ্ঞাসা আছে। সম্পাদকমহাশয় 'নবজীবনের' যে যুক্তিটা উপরে খাটাইয়াছেন সেটা 'স্বের না ভবিতব্যবাদ'মূলক? প্রকৃতির কোন 'স্তরে' উহা পাওয়া গিয়াছে?।

সাধারণীর জনৈক কবিতালেখক, নবজীবনের' প্রতি কবিজনোচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

"মস্তিষ্ক আছে ত ঠিক, চত্বারিংশ নবাধিক,
ও শিরে ত আবির্ভূত হয়নি কখন?
কে দিবে হে ভারতের নবীন জীবন?"

আমরা নহি বটে, কিন্তু বঙ্গের উন্নতি অভিলাষী এবং উপরি উদ্ধৃত কবিতাংশের প্রথম তিন চরণ ছাড়িয়া ও শেষ ছত্রের 'দিবে' স্থানে 'দিল' বসাইয়া কথাটা উপরে জিজ্ঞাসা করিয়াছি মাত্র। কিন্তু 'দিল' ছাড়িয়া কবির 'দিবে' শব্দ রাখিলে, বিষয়টার মীমাংসা হয়।

কবি পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"এ নবজীবন-যাগে, যদি বক্ষ-অস্থি লাগে,
দধিচীর মত দিতে পারিবে তখন?
দিতে কি পারিবে ছিঁড়া, কলিজা ধমনী শিরা
বহাইয়া শোণিতের মহা প্রস্রবন।"

এ বেশ জিজ্ঞাসা। এ প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর 'নবজীবনের' 'সূচনায়' আছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন;—

"সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে সাধনা করিতে আমরা পারি বটে। সকলে বলুন, এই সাধনায় যেন আমাদের জ্ঞানকৃত ত্রুটি না হয়।'

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যেন 'নবজীবন'সম্পাদকের মহতী মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

প্রথম সংখ্যা প্রচারে যে কয়টী বিষয় আছে, তাহার মধ্যে 'শ্বশুরেরই' লেখাই অধিক ও তাহাই আমাদের ভাল লাগিল। একটী কবিতা, একটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস, দুইটী প্রবন্ধ ও 'সূচনা'। 'হিন্দুধর্ম্ম'-প্রবন্ধ ও সীতারাম-উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের, সূচনাটীও বঙ্কিমবাবুর লেখা বলিয়াই আমাদের বোধ হইল, এটীর রচনা পরিপাটী হইয়াছে, যেমন সরল, তেমনি মিষ্ট, তেমনি বিনত; মধ্যে মধ্যে এক আধ বিন্দু রসিকতাও আছে। মোটের উপর, যে কথা কয়টী বলা হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত ও 'বেয়াদবিশূন্য' বটে। আমাদের স্মরণ হয়, রাখালবাবুকে আমরা একবার দেখিয়াছিলাম। কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে চতুর লোক বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। সম্প্রতি রাখালবাবু তাঁহার বিখ্যাতনামা শ্বশুরের বিজয়-পতাকা উড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যের ভরা-বাজারে উপস্থিত। যদিও এ বাজারে ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতা অধিক, তথাচ রাখালবাবুর আশ্রয় যেরূপ মহৎ তাহাতে সাফল্যলাভেরই সম্ভাবনা। আমরাও মনোবাক্যে সেইরূপ কামনা করি।

বঙ্কিমবাবুর 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' সম্বন্ধে আমাদের দুই চারি কথা বলিবার আছে। কিন্তু যাহা বলিবার আছে, তদপেক্ষা অনেক অধিক তাঁহার নিকট হইতে এখনও শুনিবার আছে। সমস্ত কথা না শুনিয়া কোন কথা বলিতে চাই না, তবে যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে এক আধ স্থান কিছু অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। প্রবন্ধটীর আমরা যে সার-সংগ্রহ দিয়াছি, তাহা হইতে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক উহা বুঝিতে পারিবেন।

জামালপুরের বাবু কালিভূষণ রায় প্রণীত শতাব্দী-পঞ্জিকার এক খণ্ড আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ১৮০১ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় বর্ত্তমান শতাব্দীর সমস্ত বৎসরের দিন-পঞ্জিকা আছে। আমরা এ রকমের যত পঞ্জিকা (Sheet Almanac) দেখিয়াছি তাহার মধ্যে কালিবাবুর এই পঞ্জিকাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইল। ইহার উদ্ভাবন প্রণালী ও সম্পাদন-কৌশল প্রশংসনীয়। মাসের তারিখ ও বারনির্ণয়ার্থ ইহাতে অতি সহজ সাঙ্কেতিক উপায় সন্নিবেশিত আছে, কোন্ তারিখে কি বার, ও কি বারে কোন তারিখ, স্থির করিতে, কিছুমাত্র আয়াসস্বীকার করিতে হয় না। কলিকাতা নিউম্যান কোম্পানির যন্ত্রে এই পঞ্জিকা মুদ্রিত। ইহার ছাপা ও বাহারও বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর।

১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস—যদি শেষ রাখিতে পারে—বঙ্গসাহিত্যে কতকটা চির স্মরণীয় হইবে। এই একই মাসে তিনটী বর্দ্ধিষ্ণু দিক হইতে তিনখানি মাসিকপত্রের যুগপৎ আবির্ভাব। 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' পরেই আমরা 'জাহ্নবী' দেখিতেছি 'জাহ্নবী'—শ্রীযুক্তবাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। এই 'পুণ্যতোয়ার' সম্বন্ধে আমাদের মতামত বারান্তরে পাঠকগণকে বিদিত করিব।